বাংলা

স্নাতকোত্তর (সি বি সি এস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

ডি এস ই/DSE-৩০২

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Dr. Shrabanti Pan,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
10	**Prof. (Dr.) Sanjib Kumar Datta,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক কেকা ঘটক — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. তুষার পটুয়া — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট ২০২৩

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellorhas invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor **(Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I wouldespecially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Professor (Dr.) Sanjib Kumar Datta
Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

পত্র : ডিএসই/DSE - ৩০২

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ১ মালঞ্চ (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–১ : মালঞ্চ উপন্যাসের বিষয় সংক্ষেপ

একক–২ : চরিত্র-নির্মাণ

একক–৩ : মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

একক–৪ : নামকরণ

পর্যায় গ্রন্থ : ২ মানুষের ধর্ম (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–৫ : ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা

একক–৬ : রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম-এর প্রেক্ষিত

একক–৭ : মানুষের ধর্মকেন্দ্রিক রাবীন্দ্রিক বোধ

একক–৮ : মানবধর্ম

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ লিপিকা (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–৯ : লিপিকার গঠনশিল্প

একক–১০ : প্রথম পর্বের রচনা-কাব্যলক্ষণাক্রান্ত পাঠ বিশ্লেষণ

একক–১১ : দ্বিতীয় পর্বের রচনায় গল্পরসের প্রাধান্য

একক–১২ : তৃতীয় পর্ব : সমাজ সচেতন ব্যঙ্গ রূপক

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ ছিন্নপত্র (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–১৩ : ছিন্নপত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

একক–১৪ : পত্রসাহিত্যের গুরুত্ব

একক–১৫ : ছিন্নপত্রে বিধৃত কবির ভাষাবয়ন কৌশল

একক–১৬ : রবীন্দ্রভাবনা : সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য সমালোচনা

বাংলা

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

পত্র : ডিএসই/DSE - ৩০২

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

ডি এস ই : ৩০২	একক	পাঠ প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১ মালঞ্চ	১	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	মালঞ্চ উপন্যাসের বিষয় সংক্ষেপ	১-৮
	২	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	চরিত্র-নির্মাণ	৯-১৪
	৩	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস	১৫-১৮
	৪	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	নামকরণ	১৯-২২
পর্যায় গ্রন্থ-২ মানুষের ধর্ম	৫	অধ্যাপক কেকা ঘটক	ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা	২৩-২৯
	৬	অধ্যাপক কেকা ঘটক	রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম-এর প্রেক্ষিত	৩০-৩১
	৭	অধ্যাপক কেকা ঘটক	মানুষের ধর্মকেন্দ্রিক রাবীন্দ্রিক বোধ	৩২-৩৮
	৮	অধ্যাপক কেকা ঘটক	মানবধর্ম	৩৯-৪৮
পর্যায় গ্রন্থ-৩ লিপিকা	৯	অধ্যাপক কেকা ঘটক	লিপিকার গঠনশিল্প	৪৯-৫১
	১০	অধ্যাপক কেকা ঘটক	প্রথম পর্বের রচনা-কাব্যলক্ষণাক্রান্ত পাঠ বিশ্লেষণ	৫২-৫৪
	১১	অধ্যাপক কেকা ঘটক	দ্বিতীয় পর্বের রচনায় গল্পরসের প্রাধান্য	৫৫-৫৭
	১২	অধ্যাপক কেকা ঘটক	তৃতীয় পর্ব : সমাজ সচেতন ব্যঙ্গ রূপক	৫৮-৬০
পর্যায় গ্রন্থ-৪ ছিন্নপত্র	১৩	ড. তুষার পটুয়া	ছিন্নপত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৬১-৬৮
	১৪	ড. তুষার পটুয়া	পত্রসাহিত্যের গুরুত্ব	৬৯-৭৯
	১৫	ড. তুষার পটুয়া	ছিন্নপত্রে বিধৃত কবির ভাষাবয়ন কৌশল	৮০-৮৫
	১৬	ড. তুষার পটুয়া	রবীন্দ্রভাবনা : সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য সমালোচনা	৮৬-৯২

পর্যায় গ্রন্থ - ১

মালঞ্চ

একক - ১

মালঞ্চ উপন্যাসের বিষয় সংক্ষেপ

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.১.১.১ : ভূমিকা

৩০২.১.১.২ : পটভূমি

৩০২.১.১.৩ : বিষয় সংক্ষেপ

৩০২.১.১.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০২.১.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০২.১.১.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-রচনাপর্বের পরিণত সৃষ্টিগুলি গুণমানে ও উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন যে সময়ে, সেটি স্রষ্টার জীবনের মধ্যপর্ব বলা চলে। 'গোরা' বা 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের সামগ্রিকতা, নিটোলত্ব কিম্বা আবেদনসমৃদ্ধি তার পরবর্তীকালে রচিত উপন্যাসসমূহে একই মহত্ব নিয়ে ঘনসংবদ্ধ হতে পারেনি। তবুও অন্তিম পর্বের রচনা শেষের কবিতা, দুইবোন, মালঞ্চ ও চার অধ্যায় বিভিন্ন মাত্রায় বাঙালী পাঠকের মনোযোগ তথা হৃদয় জয় করে নিয়েছে।

কবি জীবনের ঐশ্বর্যপর্বে নারীসম্পর্কিত একটি বিশেষ ভাবনা তথা দর্শনকে অনুভূতিবেদ্য রূপদান করতে দেখা গেছে বিভিন্ন কবিতায়। বিশেষত বিজয়িনী ও উর্বশী কবিতায় নারীর আর তত্ত্বের অপূর্ব সৌন্দর্যময় অভিব্যক্তি রবীন্দ্রবাক্য-তাত্ত্বিকদের বহু আলোচিত একটি বিষয়। কবিতায় যা সূক্ষ্ম কোমল অনুভব - যাকে নানা ছন্দে ঝংকৃত ও নানা সাজে অলংকৃত করে ভাবব্যঞ্জনা সঞ্চার করতে পারলেই কবির সার্থকতা। সেই একই বিষয়কে যদি কথাশিল্পের আঙিনায় আহ্বান করা যায় — তখন বাস্তবের কঠিন-জটিল মাটিতে শত সংঘাত-সংকটের মধ্যে তাকে বুনে দেবার আয়োজন করতে হয় কথাশিল্পীকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অল্পকালের ব্যবধানে লেখা দুটি ছোট উপন্যাসে নারীভাব সম্পর্কিত পূর্বতন কল্পনাকে নতুন আকারে উপস্থাপিত করলেন।

'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ' তাঁর সৃষ্ট সেই উপন্যাস, যা হয়ে উঠেছে সেই তত্ত্বচিন্তার বাহন। ''মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি। এক জাত প্রধানত মা, আর - এক জাত প্রিয়া।

ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

আর প্রিয়া বসন্তঋতু। গভীর তার রহস্য, তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে-ঝংকার বেজে বেজে ওঠে সর্বদেহে মনে অর্নিবচনীয়ের বাণী।'' ['দুই বোন' উপন্যাসের প্রথম অংশ-লেখনের জবানীতে]

৩০২.১.১.২ : পটভূমি

গদ্যকবিতার ছন্দে যখন পুনশ্চ শেষ সপ্তক বা শ্যামলীর মত কাব্য রচনা করে রবীন্দ্রনাথ কাব্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিলেন, কবিতায় গল্পাভাস থাকাতে অন্যতর উৎসুক্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল তাঁর এই শ্রেণীর কবিতা। এরই সঙ্গে কবির 'গল্পের বৃহত্তর ক্ষেত্রে গল্প বলিবার ইচ্ছা রূপ পাইল ....'। তার প্রমাণ 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ' নামে ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত উপন্যাসের ক্ষুদ্র রূপ - বই দুটি। দুটি রচনাই বিচিত্রা-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আরও একটি বিষয়ে এদের মিল আছে। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কিত বৈধতার বাইরে তথাকথিত 'প্রেম' এ আবির্ভাব; তার আকর্ষণে শান্তিময় ঘরোয়া জীবনছবি ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে যাবার সাহসী রূপায়ণ দুটি উপন্যাসেরই বিষয়। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণে বিষয়টি স্পষ্ট হয় - কবি 'প্রেম' ও 'ভালোবাসা'র মধ্যে সূক্ষ্ম রেখা টানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার বাহিরে সামাজিকভবে নিঃসম্পৃক্ত নরনারীর আকর্ষণজনিত প্রেমেরও ক্ষেত্র আছে। সে প্রেম-দেহসম্বন্ধ -নিরপেক্ষ .... একই পুরুষের সঙ্গে দুইজন নারীর প্রতি প্রেম কী সমাজে কী সাহিত্যে দুর্লভ নহে। কিন্তু সার্থক দাম্পত্যজীবনের দান-প্রতিদান যে বড় একটা অঙ্গ, সে -কথা অস্বীকৃতি বা বিস্মৃতি হইতেই সমাজবন্ধনের সমস্যা। নিঃস্বার্থ প্রেম দেবতা বা মহামানবে সম্ভব হইলেও হইতে পারে, জৈব ও প্রাকৃত জগতে তাহার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী।'

'মালঞ্চ' উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রীর সুখের সংসারে দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যে আকস্মিকভাবে এসে পড়েছে অযাচিত সংকট। রবীন্দ্রনাথ এমন সংকটের কথা 'চোখের বালি', 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে'তে বিভিন্ন প্রেক্ষিত-সহযোগে উপস্থিত করেছেন। 'চোখের বালি'-তে মহেন্দ্রর লোভ ও কামনা, 'চতুরঙ্গে' দামিনীর নারীত্বচেতনা, আত্মবোধ, নবীনের ভ্রষ্টাচার, এবং ঘরে-বাইরে'তে বিমলার আত্মোপলব্ধির ইতিহাসে দাম্পত্যবৃত্তের মধ্যে অসংলগ্ন অনুপ্রবেশই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভারসাম্যকে টলিয়ে দিয়েছে। এক মনস্তত্ত্বের ভাষায় যাই বলা হোক না কেন, সামাজিক রীতিনীতির দিক থেকে তা অবৈধ ও নিন্দনীয়।তবুও বাস্তব সংসারে এমন অনভিপ্রেত সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলেই জীবনের রূপকার তাকে অগ্রাহ্য করে শিল্পলোকের বাইরে ফেলে রাখতে পারেন না। নিষিদ্ধ প্রেম সমস্ত বড় সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে যথাযোগ্য ভূমিকা নিয়ে হাজির থেকেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল তার উত্তম দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরসূরী বাংলা সাহিত্যের কথাকারদের লেখায় বিষয়টি নানা স্তরে ও মাত্রায় অভিনব দিক্‌চিহ্ন স্থাপন করে জীবনবাস্তবতারই স্বাক্ষর রেখে গেছে।

৩০২.১.১.৩ : বিষয় সংক্ষেপ

মালঞ্চ-উপন্যাসে আছে সংখ্যাচিহ্নিত দশটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে অসুস্থ ও অবসন্ন নীরজার কথা। তারই স্মৃতির সূত্র বেয়ে উপন্যাসের প্রেক্ষাপটটিকে জেনে নেবার সুযোগ পাওয়া যায়। নীরজার স্বামী আদিত্য ফুলের ব্যবসায় নাম করেছিল। তার বিস্তৃত বাগানে বিভিন্ন ঋতুর ফুল ও ফলে গাছের বৈচিত্র্য, আছে জানা-অজানা সেই পুষ্প-পত্ররাজির পর্যাপ্ত সম্ভার, একটি স্বচ্ছ গভীর জলে-ভরা ঝিল। দশ বছর আগে আদিত্যর সাথে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই নীরজা আদিত্যের বাগানটিকেও পরম মমতায় আপন করে নিয়েছে। তাদের দুজনের মিলিত পরিচর্যায় বাগানের সৌন্দর্য, ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি যেমন বিকশিত হয়েচে, তেমনি দাম্পত্যটিও পূর্ণতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। 'বিবাহের পর দশটা বছর চলে গেল অবিমিশ্র সুখে'। এর পরে এল প্রথম আঘাত। 'দুর্গের প্রাচীরে প্রথম ছিদ্রে'র মতো তাদের প্রিয় সারমেয় ডলির মৃত্যু নীরজার কাছে দুর্লক্ষণের বার্তাবহ বলে মনে হলো। তারপর নীরজার মাতৃত্বকামনা সফল করতে ঘটলো তার সন্তান সম্ভাবনা। কিন্তু তাদের প্রত্যাশায় নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ হেনে নীরজার প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে তাদের সন্তানকে বলি দিতে হল। 'তারপর থেকে নীরজা আর উঠতে পারলে না। বালুশয্যাশায়িনী বৈশাখের নদীর মতো তার স্বল্পরক্ত দেহে ক্লান্ত হয়ে রইল পড়ে।' বাগানের কাজে নিজেকে বিকীর্ণ করাতে যেমন সুখ ছিল, তেমনই আনন্দ ছিল স্বামীর যথার্থ সহধর্মিণীর মতো তার পাশে থেকে বাগানের পরিচর্যায়। আকস্মিক দুর্ভাগ্যে নীরজা সেখান থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে' অসহায় একাকীত্ব জর্জরিত। তারই সঙ্গে নতুন এক আশঙ্কা তাকে বিহ্বল করে তুলল তখন, 'যখন দেখলে বাগানের কাজে সহযোগিতার জন্যে আদিত্যের দূরসম্পর্কীয় বোন সরলাকে আনাতে হয়েছে। নীরজা তার স্বামী এবং উদ্যানের ওপর এতদিন ধরে অখণ্ড অধিকার ভোগ ও প্রয়োগ করে এসেছে রাজেন্দ্রাণীর মতো। তারই আনন্দ তার মনের মধ্যে অবিরত গুঞ্জরিত হয়ে চলেছিল - তার কথায় - কাজে-আচারে-ব্যবহারে তাই বিকিরিত হয়েছে পুলকে ও মাধুর্যরসে। সেখানে, নীরজা নিজেই বুঝতে পারে আজ এক অমোঘ কীটের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। নিজের শরীর, নিজের মনটাই তার নিজের কাছে অচেনা বলে মনে হয়। পরিপার্শ্বের বিপাকে সে যেন আজ 'বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো, ভদ্র-প্রয়োজনের অযোগ্য'। নিজের কাছেই নিজের এমন অচেনা অস্তিত্বটি পাছে তার স্বামীর কাছে ধরা পড়ে যায়, এই লজ্জা ও আশংকার সে সঙ্কুচিত হতে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নীরজার সঙ্গী তার বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা আয়া রোশ্‌নি। রোশইনি নীরজাকে মানুষ করেছে। তাই সমস্ত ব্যাপারেই নীরজার প্রতি তার সমর্থন। আর নিঃসঙ্গ, কর্মহীন নীরজা মানসিক আদান প্রদানের অনুপযুক্ত জেনেও রোশ্‌নিকে ডেকে কথা বলে, সান্ত্বনা খোঁজে তারই মধ্যে দিয়ে। সেই আলাপনে যেমন আদিত্যর কাজকর্ম গতিবিধির তত্ত্ব নেওয়া থাকে, তেমনি থাকে বাগানের বিষয়ে খোঁজখবর নেবার পালা। আর সর্বোপরি, সরলার কাজে বাগানের যত্নে কতটা ঘাটতি পড়ছে তাতে দুজনে সহমত হয়। সরলার চেয়ে হলামালীর দক্ষতা নীরজার কাছে স্বীকৃত। রোশনিকে দিয়েও কবুল করাতে চায় সেই কথাই।

এই পরিচ্ছেদেই সরলাকে দেখতে পাওয়া যায় নীরজার ঘরে। কিন্তু একটি অনভিপ্রেত কাজের দায়িত্ব নিয়ে ঘরে ঢোকে সে। আদিত্য প্রতিদিন সকালে তার স্ত্রীর জন্য বাগানের সেরা ফুলটি সংগ্রহ করে তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। সেদিন নীরজা নিদ্রিত থাকায় আদিত্য জরুরী কাজে বেরিয়ে গেছে। তার স্বামীকৃত্যটি সরলাকে

পালন করার দায়িত্ব দিয়ে গেছে সে। নীরজা সরলার মারফৎ পাঠানো অবজ্ঞা ও তিরস্কাররূপে বর্ষিত হয়। বিশ্বসংসারে পিছিয়ে-পড়া নীরজার কাছে স্বামীর যেটুকু মনোযোগ ও আদর ফুলের উপহার হয়ে আসত, তা তো আজ 'গঙ্গার জল হলেও নলের ভিতর দিয়ে' আসার মতো। নীরজার ভর্ৎসনা মেনে নিয়ে সরলা 'রাগ করতে পারত কিন্তু রাগ করলে না। সে বোঝে বউদিদির বুকের ভিতরটা টনটন করছে। নিঃসন্তান মায়ের সমস্ত হৃদয় জুড়েছে যে বাগান, দশ বছর পরে আজ এত কাছে আছে, তবু এই বাগানের থেকে নির্বাসন।''

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আদিত্যর ভাই রমেনের সঙ্গে নীরজার কথোপকথন। নীরজার আত্যন্তিক আগ্রহ, সে রমেনকে রাজি করায় সরলাকে বিয়ে করতে। কিন্তু রমেন ঠাট্টা-তামাশার ছলে সে কথা এড়িয়ে যায়। সরলার সঙ্গে সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্কে সে সাবলীলভাবে মিশতে পারে। কেননা রমেনই এই উপন্যাসে সেই বোদ্ধা মানুষ - বাকি তিনজন, অর্থাৎ দুটি নারী ও একটি পুরুষ-চরিত্রের ভেতরে গড়ে-ওঠা আবর্ত ও জটিলতাকে যে অনুধাবন করতে পেরেছে। প্রত্যেকের অনুভবকে মূল্য দিয়ে রমেন তার সমাধানের চেষ্টাও করে গেছে নিজের সাধ্যমতো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে নীরজার ঘরে এসেছে আদিত্য। উপন্যাসেও এখানেই তার প্রথম প্রবেশ। আদিত্যকে প্রথম দর্শনে স্ত্রীর প্রতি আনুগত্যে, কর্তব্য পরায়ণতায় এবং সর্ব্বে মনোরঞ্জনে একজন আদর্শ স্বামী বলেই মনে হয়। কিন্তু 'ভয়'-পাওয়া কমপ্লেক্স-পীড়িত নীরজা সরলার প্রসঙ্গ টেনে আনে বারবার। আদিত্য শোনায় তার ছেলেবেলা এবং বড় হয়ে ওঠার কাহিনি। একই ব্যক্তি আদিত্যর মেসোমশাই আর সরলার জ্যেঠামশাই ছিলেন দুটি অপরিণত অনাথ ছেলেমেয়েদের অভিভাবক। আদিত্য, আজ স্বাবলম্বী, নিজের বাগানের ব্যবসায় সফল। কিন্তু সরলার জ্যেঠামশাই মারা গেলেন যখন, তার আগেই তাঁর বাগান দেনায় বিকিয়ে গিয়েছিল। আজ সরলা তাই নিজের ভারে নিজেই পীড়িতা। কিন্তু আশ্চর্য আত্মসংযম নিয়ে সে যথাকর্তব্য করে যায়। সরলার প্রতি সহানুভূতি এবং তার সম্পর্কে আদিত্যের প্রশংসাবাক্য শুনে নীরজা সহ্য করতে পারে না। তার বেদনার উৎস সে স্বামীকে নিয়ে সরলার প্রতি ঈর্ষা, এই সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। নীরজার আশঙ্কা নীরজারই কথা ও আচরণের মধ্যে দিয়ে আদিত্যের অন্তরের আড়ালে পড়ে থাকা সত্যকে বাইরে বার করে আনে। নীরজার অভিমান-আক্ষেপ-দোষারোপ-কান্নায় 'স্তম্ভিত হয়ে গেল আদিত্য। ঠিক যেন এতদিন স্বপ্নে চলছিল, ঠোকর খেয়ে উঠল চমকে'। তখনই তার স্মৃতিতে জেগে উঠল সুস্থ থাকাকালে নীরজা কতভাবেই না অপদস্ত করতে চেয়েছে সরলাকে। আদিত্যর কাছে বাগান সম্পর্কে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় সরলাকে ছাপিয়ে যাবার কথা জানান দিয়েছে নানাভাবে। এ এক ধরনের হীনমন্যতা আর অবশ্যই অসূয়াগ্রস্ত মানসিকতারই প্রমাণ দেয়। শেষ পর্যন্ত দুর্বল দেহে-মনে সব প্রতিরোধ ভেঙে নীরজা আদিত্যকে জানায় তার মুক্তকণ্ঠের নালিশ - 'আমি হলে একটার জায়গায় দশটা মালী রাখতুম কিন্তু আসতে দিতুম না আর কোনো মেয়েকে .... এমনটা কেন হতে পারল, বলব? ... তুমি আমার চেয়ে ওকে ভালোবাসো বলে। এতদিন সেকথা লুকিয়ে রেখেছিএল।' আদিত্য কিছুক্ষণ কথা খুঁজে পায় না। তারপর তাদের দশবছরের দীর্ঘ মিলিত বিবাহিত জীবন স্মরণ করিয়ে দেয়। আদিত্য নীরজার উত্তেজনা প্রশমনে জন্যই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে যায়। নীরজা ডেকে না পাঠালে তার অসুস্থ শরীর মনের ওপর উপদ্রব করতে তার কাছে আর আসবে না — এটা আদিত্যের সিদ্ধান্ত। উপন্যাসের মূল

সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে এখানে এসে। নীরজার মনে যা চাপা-ঢাকা দেওয়া ছিল- তা প্রকাশ হয়ে যেতেই সংসারের এবং সম্পর্কের ভারসাম্য বিচলিত হয়ে পড়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রেক্ষাপট রাত্রিকালীন দীঘির জলের ধারে ঘাটের বেদি। বেদির ওপরে সরলা। রমেন তার সহজাত বাচনিক দক্ষতা নিয়ে সরলার সঙ্গে কথা বলে। সরলার মনে যে অশান্তির ঝড় উঠেছে তার মধ্যে একদিকে আছে নীরজার সংসারে এসেছে তার জন্য অপরাধবোধ। কেননা নীরজার আচরণে সরলার প্রতি বিদ্বেষ গোপন থাকেনি। অন্যদিকে, আদিত্য যে জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে কষ্ট পাচ্ছে, সরলা তার জন্য মনে-মনে নিজেকেই দায়ী করছে। এইসব ভাবনা ও বেদনার কথা খুলে বলার উপযুক্ত মানুষ রমেন। তাকেই সরলা নিজের পূর্বজীবনের কথা, আদিত্যর ও তার সহজ দুই-ভাইয়ের মতো বেড়ে ওঠার কথা বলেছে। সাম্প্রতিকালে নীরজার 'বিরাগের আগুনের আভায়' নিজের অন্তরলোক কীভাবে নিজের কাছে ধরা পড়েছে তাও বলতে পেরে তার হৃদয় কিছুটা হালকা হয়েছে। বউদির প্রতি সে অন্যায় করেছে - এমন চিন্তা রমেন প্রতিবাদ করে উড়িয়ে দিয়েছে - '' দেখো সরলা, আমি মানিনে ওসব পুঁথির কথা। দাবির হিসেব বিচার করবে কোন্ সততা দিয়ে। তোমাদের মিলন কতকালের, তখন কোথায় ছিল বউদি।'' সরলা যদিও জটিল পরিস্থিতি থেকে মুক্তির আর কোনো রাস্তা দেখতে না পেয়ে স্বদেশী রমেনের কাছে জানতে চেয়েছিল জেলে যাবার উপায় কি! সেই কথা থেকে তার অন্তরটি যখন মেলে ধরেছে, রমেন সরলা ও আদিত্যর আবেগ-অনুরাগকে অস্বীকার্য মনে করল না। এমন সময় আদিত্য সেখানে প্রবেশ করেছে। নীরজার ডাকে রমেন গেছে তার কাছে। সরলা ও আদিত্য নিজেদের মুখোমুখি কখনো হয়নি এমন অকপট সত্যকে সামনে রেখে। উন্মোচিত এই সত্য তাদেরকে বিচ্ছিন্ন না করে ছাড়বে না কোনোমতেই। আদিত্য বলে '' তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে এ আমি ঘটতে দেব না, দেব না। এ অন্যায়, এ নিষ্ঠুর অন্যায়।'' সরলা তার বিবাহসম্বন্ধগুলি একসময় যেন ফিরিয়ে দিয়েছিল আজ আদিত্য তার ব্যাখ্যা খুঁজে পায়। তাদের ভেতরের অনুক্ত সম্বন্ধের স্বরূপ আদিত্যর মনে জেগে উঠেছে নীরজার ঈর্ষার ঘা খেয়ে। 'ভালোবাসি তোমাকে, একথা আজ এত সহজ করে সত্য বলতে পারছি এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে। আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম।' পুরুষের নবাবিষ্কৃত এই প্রেমাবেগ সরলার স্থৈর্য এবং সহনশীলতায় বাধা মানতে চায় না। তবুও ব্যথিতহৃদয়ে নিরুপায় আদিত্য বাধ্য হয় এই পরিস্থিতিতে নিরুদ্যমভাবে মেনে নিতে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নীরজার আহ্বানে একাধারে তার দেবর এবং সখা এসেছে - নীরজার মানসিক সঙ্কটে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে রমেনের উপস্থিতি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষে আদিত্য যখন নীরজার ঘর ছেড়ে চলে গেছে, তখন নীরজার অনতিক্রম্য বেদনা সে আর কাকেই বা ব্যক্ত করে বোঝাতে পারে রমেন ছাড়া? রমেনকে নীরজা দেখায় তাতে লেখা আদিত্যর চিঠিখানি। যাতে সরলার প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে আদিত্য একচুল সরতে নারাজ - তাতে তার কর্তব্যচ্যুতি ঘটবে। 'তোমার সঙ্গে কথা হবার পর এই প্রশ্নই বার বার মনে আমার উঠেছে, আমিই ওকে আশ্রয় দিয়েছি, না আমাকেই আশ্রয় দিয়েছে সরলা আমার গলগ্রহ।'' সরলার জ্যেঠামশায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতার সূত্রে সরলাকে রক্ষা করতে হবে। নীরজার

সঙ্গে তার দেখাশোনা যাতে না হয় তার জন্য প্রয়োজনে অন্য জায়গায় অন্য ব্যবসায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেই অর্থসংগ্রহে 'আমাদের এই বাগানবাড়ি বন্ধক' রাখতেও দ্বিধা নেই আদিত্যর। এই চিঠি পড়ে নীরজা সম্পূর্ণত বুঝতে পেরেছে যে তার ঘর ভেঙে গেছে। রমেন তখন সবচেয়ে বাস্তব অবস্থানে থেকেও আদর্শের কথাটি উচ্চারণ করেছে, নীরজাকে যা পথ দেখাবে আত্মজয়ে — 'যদি যাবার দিন এসেই থাকে, তা হলে যাকে বড়ো করে পেয়েছ, তাকে বড়ো করে ছেড়ে যাও।' তবেই নীরজার সংসারে নীরজার অবশেষের পরেও শ্রদ্ধার আসনে আসীন থাকবে সে। এই ত্যাগের প্রশান্তি, দানের তৃপ্তি নীরজা গ্রহণ করতে চাইল। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলনটুকুর ধৈর্য সে রাখতে পারে না। আদিত্য ঘরে প্রবেশ করলে নীরজা সরলাকে নিয়ে আসবার অনুরোধ জানায়। আদিত্য সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে চেয়েও পারেনা। সরলা এল ঘরে। নিজেকে দান করবে বলে নীরজা যে-সংকল্প স্থির করেছিল, তার বনিয়াদ যে কত দুর্বল, তা প্রকাশ গয়ে পড়ল সরলাকে দেওয়া তার উপহারের সঙ্গে তার অভীপ্সায়। সে বলল - সরলা ওই মালাটি যেন নীরজার হয়ে গলায় পরে। কারণ ''বিশেষ বিশেষ দিনে এ মালা কতবার পড়েছি সে তোমার দাদা জানেন। তোমার গলায় থাকলে সে দিনগুলি ওঁর মনে পড়বে।'' এই দেবার প্রস্তুতি যেন প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে। কেননা আত্মঘোষণা ও স্বকীয় প্রতিষ্ঠাকে অক্ষয় করে রাখবার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নিহিত ছিল না এই দানের মধ্যে। এতে নীরজার দীনতা যেমন প্রকাশ পেল, অন্যদিকে সরলার অসম্মানও প্রকট হয়ে উঠল। এমন পরিস্থিতিতে সরলা নিজের মানসিক অবস্থার কথা অকপটে বলে ফেলল। এতদিন পর্যন্ত তার বিশ্বস্ততা সন্দেহাতীত থাকলেও এখন আর তার মন সেই অবস্থায় নেই। তবে 'ভাগ্য যে দান থেকে আমাকে বঞ্চনা করেছে, কাউকে বঞ্চনা ক'রে সে-দান আমি নেব না।' সরল নিষ্ক্রান্ত হলে অশান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত আদিত্যও ঘর ছেড়ে গেল। অপ্রস্তুত এবং হতাশ নীরজা রমেনের কথা থেকে বুঝল যে তার মন মুক্ত হতে পারেনি। ঠিক সুরটি যে তার কথায় ও আচরণে বেজে ওঠেনি একথা বুঝে নীরজার মন অনুশোচনায় হাহাকার করে ওঠে।

সপ্তম পরিচ্ছেদের শুরুতে দৃশ্যান্তরে আদিত্য সরলার সঙ্গী হয়ে বেরিয়ে আসাতে সরলা তার প্রতিবাদ করেছে। ইতিমধ্যে রমেন এসে আদিত্যকে তার স্ত্রীর পরিচর্যায় পাঠিয়ে দেয়। তখন সরলা রমেনকে আত্যন্তিক আনুরোধ জানায় কোনোভাবে ইংরেজ সরকারের বিরোধিতার সূত্র সরলার কারাবাসের ব্যবস্থায় সাহায্য করবার জন্য। এছাড়া আদিত্য-নীরজার পারিবারিক আবহে জমে - থাকা রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণা থেকে মুক্তির থেকে কোনো পথ জানা নেই তার। আদিত্য ফিরে আসে অনতিকালের মধ্যেই। রমেন বেরিয়ে আসে। একই প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে অষ্টম পরিচ্ছেদ। সরলা তখন নিজের চলে যাবার কথা বলে আদিত্যকে। অনুরোধ করে নীরজার যেকটা দিন পরমায়ু আছে, তারই মধ্যে তার মন থেকে সন্দেহের কাঁটা উপড়ে দেবার জন্য। বলে, 'অমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্তকালের শেষ কটা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করে। আদিত্য শর্তসাপেক্ষে রাজি হবে জানায়। সেই শর্তটি বড় নির্মম, বড়োই কঠোর। ''তুমি যা বলছ তা শুনব এবং বিনা ত্রুটিতে পালন করা সম্ভব হবে যদি নিশ্চিন্ত জানি একদিন তুমি পূর্ণ করবে আমার সমস্ত শূন্যতা।''

নবম পরিচ্ছেদে নীরজা আয়ার কাছে খবর পায় সরলা স্বদেশী করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। জেল হয়েছে তার। রমেনেরও সেই একই অবস্থা- সেও কারারুদ্ধ। নীরজা ছট্‌ফট্ করে - তার মনে হয়, সরলার 'বেহায়াগিরির

একশেষ, বাগান থেকে আরম্ভ করে জেলখানা পর্যন্ত' — এ সরলার বাহাদুরি-দেখাবার প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু রোশ্‌নির কথায় পরক্ষণেই সে নিজের ভুল বুঝতে পারল। সরলাকে হেয় করার বদলে সে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখল একখানা। জেলে পাঠিয়ে দিল সেই চিঠি। রমেনের উদ্দেশে মনে-মনে প্রণাম জানাল। কেননা তারই দেখানো পথে সে আজ চলতে চাইছে - আত্মত্যাগের মধ্যে থেকেই পেতে চাইছে শান্তি।

অন্তিম পরিচ্ছেদ একটু ঘটনাবহুল। নাটকীয় দ্বন্দ্ব এখানে উত্তাল হয়ে রূপ নিয়েছে। ঘটনাসংঘাত, মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় দশম পরিচ্ছেদে বিচিত্র জটিলতা ঘনিয়ে তুলে পরিণামমুখী হয়েছে। নীরজার ঘরে আদিত্য স্ত্রীর পরিচর্যা ও শুশ্রূষায় রত। নীরজা স্বামীকে বোঝাতে চায় যে মালী ও মজুর পরিচালনা করে সে রোগশয্যা থেকেও তাদের বাগানের ক্ষয়িষ্ণু চেহারা ফিরিয়ে দেবে। সরলার অনুপস্থিতিতেও বাগান কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বলতে বলতেই তার অন্তরের বেদনাটি প্রকাশ পেল। ''আদিত্যের হাত হঠাৎ জোর করে চেপে ধরলে, বললে, ''একেবারেই থাকব না, কিচ্ছুই থাকব না? বলো আমাকে... বলো না আমাকে সত্যি করে।'' করুণ আর্তকণ্ঠে সে মিনতি করে '' সরলার উপর অন্যায় করেছি। তোমার পায়ে ধরে বলছি আর অন্যায় করব না। যা হয়েছে, তার জন্যে আমাকে মাপ কোরো। কিন্তু আমাকে ভালোবেসো, ভালোবেসো তুমি, যা চাও আমি সর করব।'' ... ''কাল রাত্রি থেকে বারবার পড় করেছি, এবার দেখা হলে নির্মল মনে ওকে বুকে টেনে নেব আপন বোনের মতো। তুমি আমাকে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সাহায্য করো। বলো, আমি তোমার ভলোবাসা থেকে বঞ্চিত হবে না, তাহলে সবাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে তেতে পারব।'' নীরজা কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যখন তখন সরলার ছাড়া পাবার খবর আসে। নীরজা রমেনকে স্মরণ করে মন দৃঢ় করে রাখতে চায়, বারবার করে জপমন্ত্র উচ্চারণের মতো বলে, ' দেব দেব দেব, সব দেব।' সরলা ঘরে আসে। সে নীরজার পা ছুঁতেই যেন বিদ্যুৎ স্পর্শ ঘটল। এতক্ষণের সমস্ত প্রস্তুতি ব্যর্থ হয়ে গেল। সর্বশক্তি নিয়ে শেষবারের মত উঠে দাঁড়াল নীরজা দিতে সে পারবে না, কিছুই, 'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, ...পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত''- অদ্ভুত গলায় এই শেষ কথাগুলি বলেই মেঝের ওপরে স্তব্ধ হয়ে পড়ে গেল নীরজা।

৩০২.১.১.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'মালঞ্চ' উপন্যাসের প্রকাশ কাল কত?

২। 'মালঞ্চ' উপন্যাসের মূল বক্তব্য বিষয়টি সংক্ষেপে বিবৃত করো।

৩। উপন্যাসটি রচনায় প্রেক্ষাপট কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

৩০২.১.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য — বুদ্ধদেব বসু

৪। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৫। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক (৩য় খণ্ড) — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৬। রবীন্দ্রনাথ — সুবোধ সেনগুপ্ত

৭। রবীন্দ্রমনন — রথীন্দ্রনাথ রায়

৮। রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন — অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

৯। রবীন্দ্র উপন্যাস-সমীক্ষা — সত্যব্রত দে

১০। রবীন্দ্র উপন্যাস নির্মাণ শিল্প — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক - ২

চরিত্র নির্মাণ

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.১.২.১ : নীরজা চরিত্র
৩০২.১.২.২ : আদিত্য চরিত্র
৩০২.১.২.৩ : সরলা চরিত্র
৩০২.১.২.৪ : রমেন ও অন্যান্য চরিত্র
৩০২.১.২.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৩০২.১.২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০২.১.২.১ : নীরজা চরিত্র

'মালঞ্চ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীরজা। উপন্যাসের সূচনা রোগশয্যালীন নীরজার বর্ণনায়। তার স্বামী আদিত্যের জীবিকা ও জীবন যে মালঞ্চকে ঘিরে, দশবছরের বিবাহিত জীবন নীরজা সেই বাগানের কাছেই উৎসর্গ করে দিয়েছিল। এতদিন পর এল তার প্রথম সন্তানসম্ভবা। কিন্তু তা অচরিতার্থ থেকে গেল। সন্তানকে বাঁচানো গেল না, সে নিজেও অশক্ত দেহ-মনে শয্যা বন্দী। তার স্মৃতিতে ঘুরে ফিরে আসে দশ বছরের নিষ্কন্টক দাম্পত্যের মধুময় স্মৃতি। স্বামীর সহধর্মিণীরূপে তার সবৈব ভূমিকা থেকে এখন যেন সে পিছিয়ে পড়ছে। এমনই আশঙ্কার মাঝে অন্য মেঘ ঘনিয়ে ওঠে নীরজার মনের আকাশে। তার স্বামীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়া, ছোটবেলা থেকে একই অভিভাবকের অবধায়কত্বে বেড়ে-ওঠা সরলা এসেছে আদিত্যের সংসার আর বাগানের সহায়তা করার কাজে আদিত্যেরই আহ্বানে। নীরজার সংকট সরলাকে নিয়ে।

নীরজা-চরিত্রের মূল ভিত্তি প্রেম। তার শ্রমনিষ্ঠা, হাস্য-আলাপনদক্ষ সতেজতা এবং স্বামীসৌভাগ্য তাকে আত্মবিশ্বাসে ভরে রেখেছিল। সেখান থেকে রোগজীর্ণ নিষ্কর্মের মধ্যে নির্বাসন তাকে অসহায় করেছে। সরলার আগমনে সে অক্ষম ঈর্ষায় জর্জরিত হয়েছে। স্বকীয় কর্মোদ্যগ নিয়ে পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি পাবার রাস্তা নেই সে জানে। সেখান থেকেই তার মানসিক আভিজাত্য ও রুচি অবনমিত হয়ে পড়েছে। জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে সরলাকে হেয় করে সে স্বস্তি পেতে চেয়েচে। তার জ্বালা প্রশমিত হয়নি তাতে, আদিত্যকে বিনা প্ররোচনায় তীব্রভাবে অভিযুক্ত করেছে। ফলে যা ছিল সুপ্ত, তাই যেন নীরজার ঈর্ষার ইন্ধন পেয়ে মহাসমারোহে জেগে উঠেছে আদিত্যের হৃদয়ে।

অন্যদিকে, সরলাকে অন্যত্র সংশ্লিষ্ট করার জন্য নীরজা কখনও রমেনের সঙ্গে তার বিবাহ সম্বন্ধ করতে তৎপর হয়েছে, কখনও আদিত্যকে জোর করেছে সরলার বিবাহ দিতে, নয়তো বারাসাতের মেয়ে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজে লাগিয়ে দিতে। এ সমস্তই নীরজার অন্তর্দাহ এবং নিরাপত্তাহীনতাবোধ থেকে জাত। তার উদ্বেগ ও দ্বন্দ্ব সমস্ত উপন্যাসের সঙ্গে বাতাসের মতো জড়িয়ে রয়েছে। তাকে মানসিক শান্তি দেবার চেষ্টা করেছে যে রমেন, সে প্রত্যক্ষ সমস্যায় যুক্ত নয়, কিন্তু আদিত্য-নীরজা-সরলার ত্রিভুজ দ্বন্দ্বজটিলতা বোঝে, সহমর্মিতা দিয়ে। একজন্য হিতৈষী বন্ধুর মতো নীরজার প্রশান্তি আনার জন্য অনুশীলনে সে সহায়তা করে। কিন্তু এই পৃথিবীর সবকিছু ছাড়াও স্বামীপ্রেমের একতম অধিশ্বরীর পদ নিঃশর্তে চিরকালের মতো ছেড়ে যেতে হবে — এ কিছুতেই মেনে নিতে পারে না নীরজা। তাই সরলাকে তার সব কিছু দিয়ে যাবার জন্য নিজেকে তৈরী করলেও শেষপর্যন্ত নিজেকে উত্তীর্ণ করতে পারে না। তার আত্যন্তিক জীবনকামনা এবং প্রেমাবেগ ত্যাগমন্ত্রের কাছে আশ্বাস পেতে লাভে ব্যর্থ হয়। মালঞ্চের বর্ণালি-সুরভি গভীর জীবনরসের সন্ধান দেয়নি নীরজাকে। যেহেতু প্রাক্-বিবাহ বা বিবাহোত্তর কালেও স্বামী ছাড়া অন্য কোনোও বিশেষ মানবিক সম্পর্কে বাঁধা পড়ার কোনও সংকেতও উপন্যাসে নেই, তাই স্বামীকে এবং স্বামীরই একাংশরূপে মালঞ্চকেও হারাবার বেদনা নীরজার মনপ্রাণকে শূন্যতার হাহাকারে ভরিয়ে তোলে। তার ব্যাকুল বেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তার অনুপস্থিতির দিনগুলির কথা ভেবে —''ঐ বাগানটা সম্ভব আর আমিই হব অসম্ভব, এ হতেই পারে না, কিছুতেই না। সন্ধে বেলায় অমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই দুলবে সুপারি গাছের জাল ঠিক আমারই চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি। মনে কোরো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে, আমার আঙ্গুলের ছোঁয়া আছে তাতে। বলো, মনে করবে?'' এইটুকু আশ্বাসের জন্য তার মন উদ্বেলিত— কেননা মৃত্যু আসার আগে থেকেই তার শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে যাবার সংকেত সে পেয়ে গেছে। নীরজার নিগূঢ় জীবনবাসনার এমন ট্রাজিক বৈপরীত্য তার পক্ষে কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'এতদিনের সুখের সংসারকে অত করে আঁকড়ে ধরতে (তার) এই নৈরাশ্যের কাঙালপনা'। তার থেকে উদ্ধার পেতে রমেনের পরামর্শ সে মেনে নিতে চায় — 'যাকে বড়ো করে পেয়েছ, তাকে বড়ো করে ছেড়ে যাও।... যা নিজে ভোগ করতে পারবে না, তাও প্রসন্ন মনে দান করতে পার না যাকে এতদিন এত দিয়েছ? - নীরজা তার বাগান-ঘরসংসার-স্বামী সমস্তই স্বেচ্ছায় দেবার জন্য তৈরী হতে চায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই সংকল্প ফলপ্রসূ হয় না। সরলার জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকার পর যখন সে আসে তখন নীরজা মানসিক স্থৈর্য রক্ষা করা দূরের কথা - অসম্ভব স্নায়বিক চাপে এক উৎকট প্রতিক্রিয়ায় ফেটে পড়ে। চরম উত্তেজনার ফলে তার মৃত্যু নেমে আসে। রবীন্দ্রসাহিত্যের পক্ষে ব্যতিক্রমী কিন্তু এক জ্বলন্ত বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় রেখেছে তাঁর পরিণত বয়সের সৃষ্টি নীরজা-চরিত্র। রবীন্দ্রনাথের সর্বাত্মক শুদ্ধসৌন্দর্যবাদ বা শুভদ অধ্যাত্মবিবেক নিয়ে কটাক্ষের উপযুক্ত জবাব রয়েছে নীরজা চরিত্রের মধ্যে, যেমন আছে কবির ভিন্নতর শিল্পমাধ্যম- চিত্রকলার অভিনবত্বে ও অবিস্মরণীয়তায়।

৩০২.১.২.২ : আদিত্য চরিত্র

'মালঞ্চ' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র আদিত্য। সমস্ত কাহিনি ও ঘটনা সংস্থানে আদিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায় তাকে নায়ক বলে আখ্যাত করা যায়। বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্যের মাঝে অন্যতর নারীর অনুপ্রবেশ

রবীন্দ্র-উপন্যাসে প্রায় প্রথম থেকেই দেখা গেছে। 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রতি অধিকার বিস্তার করতে চেয়েছিল। মালঞ্চের অব্যবহিত আগের রচনা 'দুই বোন' - এর শশাঙ্কও তার শ্যালিকা ঊর্মিমালার প্রতি প্রেমানুরাগ ব্যক্ত করেছিল। এই দুই নায়কের মানসিক চাঞ্চল্য, ভারসাম্যহীনতা এবং কর্তব্যচ্যুতির যে পরিচয় রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন, আদিত্যকে সেই দলে ফেলা যায় না। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে তুলনামূলকভাবে আদিত্য বলিষ্ঠতা ও ঋজুতা দ্বারা অন্বিত।

প্রাক্ বিবাহ জীবনের প্রেমানুভব আদিত্য সচেতনভাবে উপলব্ধি করেনি। বিবাহের মধ্যে দিয়ে যে নারীকে সে পেয়েছিল, তাকে স্ত্রী এবং প্রেমিকারূপে সঙ্গে নিয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিয়েছে বিবাহ-পরবর্তী দশ বছর। নীরজা অসুস্থ হওয়ার ফলে তার ও বাগানের পরিচর্যার ভার নিয়ে যখন সরলার আগমন ঘটেছে তখন থেকেই জটিলতার শুরু। প্রকৃতপক্ষে নীরজার ঈর্ষার ইন্ধন থেকেই যেন ছাই-চাপা আগুনের মতো আদিত্যের মনে চাপা-পড়া ভালোবাসার সত্যটি প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এই ভালোবাসার ইতিহাস আদিত্যের বিবাহপূর্ব জীবনের গভীরে; তার বাল্যসহচরী দূর সম্পর্কের আত্মীয়া সরলার সঙ্গে একই বাড়ীতে একই শিক্ষায় মানুষ হয়েছে সে। তাদের মধ্যে একটি সহজ-সরল আন্তরিক সম্পর্ক থাকলেও একে ভালোবাসা বলে আদিত্য বুঝতে পারিনি। নাড়া খেয়ে ভেতর থেকে সেই ভাবনাটি জেগে ওঠার পর আদিত্য সরলার স্বেচ্ছায় অবিবাহিত থাকবার কারণটিও উপলব্ধি করেছে। আত্মআবিষ্কার ও আত্মোপলব্ধির পর আদিত্য দৃঢ়মনে সত্য প্রতিষ্ঠায় তার সংকল্প স্থির করেছে। নীরজার প্রতি দশবছরের যে আদর্শ স্বামীত্ব আদিত্য পালন করে গেছেন সেখানে কোনো খাদ ছিল না। আবার সরলার প্রতি তার প্রেমানুভবের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসরণেও সে কোনো বাধা মানতে রাজি নয়। ''আদিত্য সরলার দুই হাত চেপে ধরে বললে - ভালোবাসি তোমাকে, একথা, এত সহজ করে সত্য করে বলতে পারছি এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। ... আমি বলছি একে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম।'' আদিত্যের এমন বলিষ্ঠ প্রত্যয় তাকে চপলমতি মহেন্দ্র এবং লঘুচিত্ত শশাঙ্কর চেয়ে গভীর রেখায় মুদ্রিত করে। পূর্বতন একটি সম্পর্কের ইতিহাস-সূত্র আদিত্যকে হীনতা ও দুর্বলতা থেকে রক্ষা করেছে।

তবে আদিত্যকে নিয়ে সমালোচকমহলে যে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি, তা নয়। প্রথমত মৃত্যুপথযাত্রিণী নীরজা সব কিছু জেনেও নিতান্ত নিরুপায় হয়ে বারে বারে তার স্বামীকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করে। তার জিজ্ঞাসা হ'ল, তার মৃত্যুর পর সে কোনোবাবেই কি তার স্বামীর জীবনে বা বাগানে থাকতে পারবে না? আদিত্য এই প্রশ্নের উত্তরে নীরজাকে কোনো স্তোক দেয়নি। ''যমের দরজায় ওপারের জগৎ তার কাছে অজানা।''---স্পষ্ট করেই এই কথাটি শুনিয়ে সব খোয়ানো নীরজাকে সে আরও হতাশা ও শূন্যতার আঁধারে এগিয়ে দিয়েছে। এতে আদিত্যের সততা প্রমাণিত হলেও তার মমত্ব ও মানবতাবোধ প্রকাশ পায়নি। এছাড়া সরলার প্রতি তার মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ার পর সরলা তাকে স্ত্রীর প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশে তাকে অটল থাকতে বলেছে। তখন আদিত্য যে শর্তটি করেছে, তাতে আদিত্যের মানবিক বোধ সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে। নীরজার স্বামী হিসেবে তার কর্তব্যবোধ এবং সরলার প্রেমিক হিসেবে তার নবজাগ্রত হৃদয়বোধের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র উপন্যাসে স্থান পায়নি। আদিত্যকে যতখানি কর্তব্যপরায়ণ ও নীতিনিষ্ঠ হিসেবে প্রথমাবধি দেখা যায়, পরবর্তী জটিল আবহে তাকে সেইভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে দেখা যায়নি। বরং সরলার 'দিদির জীবনান্তকালের শেষ কটা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করে...'' এই অনুরোধ মানার বদলে আদিত্য যখন তাকে দিয়েও একটি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে চেয়েছে - ''তুমি

যা বলছ তা শুনব এবং সেটা বিনা ত্রুটিতে পালন করা সম্ভব হবে যদি নিশ্চিন্ত জানি একদিন তুমি পূর্ণ করবে আমার শূন্যতা।...'' অর্থাৎ নীরজার মৃত্যুর পর সরলা আসবে আদিত্যের জীবনে- এই আশ্বাস পেলে তবেই সে নীরজার মৃত্যুশয্যার পাশে মরমী স্বামীর ভূমিকায় 'অভিনয়' করবে। এতে আর যাই হোক, আদিত্যের বিবেকপ্রাণ নীতিনিষ্ঠ ভাবমূর্তিটি অক্ষুণ্ণ থাকেনি। অথচ এই অবস্থায় দ্বিধাদীর্ণ আদিত্যের মানসংকট প্রতিফলিত হলে চরিত্রসৃষ্টির উৎকর্ষ প্রমাণিত হতো। বরং তাকে আবেগাপ্লুত নিষ্ঠুর নিয়ন্ত্রণহীন মানুষ বলেই মনে হয়েছে - অন্তত এই পর্বে এসে। আর এইখানেই আদিত্য-চরিত্রটির সাফল্যের অন্তরায় ঘটেছে বলা চলে।

৩০২.১.২.৩ : সরলা চরিত্র

সরলা রবীন্দ্রনাথের কবিমানসীর ধাঁচে অনেকখানি গড়া। পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলিতে আমরা যেমন হেমনলিনী -সুচরিতা-কুমুকে পেয়েছি - তারই উত্তরসূরী সরলা। সরলা জ্যাঠামশায়ের গৃহে ললিত। তাঁর সুশিক্ষা সে যেমন পেয়েছে, তেমনি মাতৃস্থানীয়া কোনও নারীর স্নেহলালান থেকে সে থেকেছে বঞ্চিত। যাঁরা সুশিক্ষা সে যেমন পেয়েছে, তেমনি মাতৃস্থানীয়া কোনও নারীর স্নেহলালন থেকে সে থেকেছে বঞ্চিত। যার ফলে তার স্বভাবের মধ্যে স্থৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সহজেই গড়ে উঠেছে। এই স্বল্পভাষী মেয়েটির বুদ্ধিমত্তা ও ঔচিত্যবোধ এমনই সহজাত যে, আলাদা করে তা নজরে পড়েনি এমন কি আদিত্যেরও। অথচ আদিত্য বিবাহিত জীবনে দশ বছর ধরে সুখী দাম্পত্যের মধ্যে থেকেই সরলার ওপরে অনায়াস দাবি এবং স্বচ্ছন্দ নির্ভরতা রেখে দিয়েছে। সরলাকে পাত্রস্ত করার কথা জ্যাঠামশায় ভাবেননি।। কেননা তাঁর পুত্রসন্তান প্রবাসী। তাঁক প্রিয় সন্তান তাঁর বাগান। সেই বাগানের প্রতি এতটাই তিনি অন্ধ মোহগ্রস্ত সে সরলার ভবিষ্যৎ না দেখে বাগানের ভবিষ্যতের দায় রেখে গেলেন সরলার ওপরে। আদিত্য সে সরলাকে ভালোবাসে, তা নিজে সে বুঝতেই পারেনি কোনোদিন। অথচ কতো সাবলীলভাবে স্ত্রীর অসুস্থতার পরিচর্যা ও বাগানের তত্ত্বাবধানের কাজে সরলাকে ডেকে পাঠিয়েছে সে। এই সমস্ত বিষয় নিরীক্ষা করলে মনে হয়, বুদ্ধিমতী গুণসম্পন্না সৎস্বভাব কোমল ও শ্রীময়ী এই মেয়েটি প্রথমাবধি শুধু ব্যবহৃত হয়েছে। নিরুচ্চারভাবে সে নীরজার র্ভৎসনা ও অন্যায় দোষারোপ মেনে নিয়েছে।

অথচ সরলার মধ্যে ব্যক্তিত্বের এবং আত্মনির্ভরতার যে অভিজ্ঞান লেখক ছুঁইয়ে দিয়েছেন, সেখান থেকেই নীরজার পাশে তার স্বকীয়তার দীপ্তি আমাদের 'বৌদ্ধিক কৌতুহল' কে আকৃষ্ট করে রাখে। নীরজার অস্তিত্ব সবটুকুই তার স্বামীর ওপরে নির্ভরশীল। স্বামীকে হারানো অর্থ তার সার্বিক বিনষ্টি। কিন্তু সরলার স্বচেতনা তাকে স্বক্ষেত্রের সন্ধান দিতে পারে। ঘটনাবর্তে পড়ে আদিত্যের প্রতি তার ভালোবাসার কথা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন সরলা তা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। আবার সংসার ও সমাজকে মূল্য দিয়ে নিজের কর্তব্য স্থির করেছেন। আদিত্যকে বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছে। রমেনের সঙ্গে সরলার সাবলীল বন্ধুত্ব নতুন যুগের মানসস্বাচ্ছ্যন্দকে সংকেতিত করে। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে সংস্কারবাহিত জড়তা সরলার ঋজু মানসিকতাকে স্পর্শ করতে পারেনি। রমেনের সহায়তা নিয়ে জেলবাসের সুযোগ গ্রহণ- আদিত্য নীরজার সংস্পর্শ থেকে মুক্ত হবার উপায়মাত্র। সরলার কারাবাস এবং আকস্মিক মুক্তি খানিকটা আরোপিত বলে মনে হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। সর্বোপরি বলা যায়, একাধারে 'রোমান্টিক' ও বিচক্ষণ, আশ্রয়হীনা হয়েও অপরকে মানসিক আশ্রয়দানের শক্তিসম্পন্না, সহনশীল ও ব্যক্তিত্বময়ী সরলা চরিত্রটি রবীন্দ্রসৃষ্টির ইতিহাসে অনন্য চরিত্রসৃজন।

৩০২.১.২.৪ : রমেন ও অন্যান্য চরিত্র

'মালঞ্চ' উপন্যাসে মূল চরিত্র তিনটি — আদিত্য, নীরজা-সরলা। লেখকের মনোযোগ এবং পরিকল্পনা এদের যতখানি নিয়ন্ত্রণ করেছে — অন্যান্য চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে তা নয়। কার্যত মূল চরিত্রস্ফুটনে রমেন, সংযোগরক্ষায় রোশ্‌নি- আয়া বা হলধর মালী এই তিনটি চরিত্রের সৃষ্টি।

রমেন আদিত্যের সম্পর্কিত ভাই। আদিত্যের ও নীরজার যুগল সংসারে অন্য কোনো আত্মীয়-বন্ধুর স্পষ্ট ও অন্তরঙ্গ ভূমিকার পরিচয় উপন্যাসে নেই। পূর্বাবিবৃতি থেকে সরলার কথা আছে, রমেনের তাও নেই। কিন্তু যে-মুহূর্তে ত্রিভুজ-সংকট ঘনিয়ে উঠেছে, উপন্যাসে তখন থেকেই রমেনের গুরুত্ব। প্রধান তিনটি চরিত্রই নির্দ্বিধায় তাদের সমস্যা ও সংকট রমেনের কাছে ব্যক্ত করেছে। রমেনও নিজেকে অসম্পৃক্ত রেখে অনেকটা যাত্রার বিবেকের মতো ভূমিকা নিয়েছে। ফলত অসহায় হৃদয়াভারাতুর নীরজা রমেনকে অনুরোধ করেছে তাকে পথ দেখাবার জন্য। রমেন যখন নীরজার পথ ও পাথেয় সহজ করে দয়ে, তখন তার মধ্যে যেন রবীন্দ্রজীবনদর্শনকেই রূপ পেতে দেখি — ''বউদি, একটা কথা বলি শোনো। যতক্ষণ মনে করবে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ বুকের পাঁজর জ্বলবে আগুনে। পাবে না শান্তি। কিন্তু স্থির হয়ে বসে বলো দেখি একবার —'দিলেম আমি। সকলের চেয়ে যা দূর্মুল্য তাই দিলেন তাঁকে যাঁকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি' - সব ভার যাবে এক মূহূর্তে নেমে। মন ভরে উঠবে আনন্দে। গুরুকে দরকার নেই; এখনই বলো - 'দিলেম দিলেম, কিছুই হাতে রাখলেম না, আমার সব-কিছুই দিলেম, নির্মুক্ত হয়ে নির্মল হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেম, কোনো দুঃখের গ্রন্থি জড়িয়ে রেখে গেলেম না সংসারে'।''

রমেন আদিত্যকে সুস্থিত হতে পরামর্শ দিয়েছে - ভারসাম্য রক্ষা করে হৃদয় আর কর্তব্যবুদ্ধির সংস্থান করে নেবার রাস্তা বলেছে; সরলাকে রমেনই সত্য প্রেমনিষ্ঠার সততায় আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। আবার বাস্তব সংঘাত এড়াতে জেলবাসের উপায়ও বার করেছে তার জন্য।

এই সব ক্রিয়াশীলতার দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও রমেন চরিত্র আমাদের মনে দাগ কাটে না তেমন করে। তার অন্যতম কারণ নিশ্চয়ই এই যে সহমর্মী অবস্থানে থাকা আর ব্যক্তিগত আশ্লেষ-সংশ্লেষে জড়িত হওয়া এক কথা নয়। রমেনের ব্যক্তিক আবেগস্পর্শ উপন্যাসে নেই বললেই চলে। তাই সে সম্পূর্ণ একরক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি।

রোশ্‌নি ও হলামালী চরিত্র দুটির প্রয়োজনসীমা রক্ষা করেই লেখক তাদের উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। রোশ্‌নি নীরজাকে মানুষ করেছে, সে তার বাপের বাড়ি থেকে আসা আয়া। কিন্তু বিবাহের আগের নীরজার প্রত্যাশিত কোনও ভূমিকাই রোশ্‌নির মাধ্যমে প্রকাশ পায়নি। সরলা-সম্পর্কিত যা কিছু চিন্তা ঈর্ষা-সংশয়-বিদ্বেষ সবই নীরজা রোশ্‌নিকে নিষ্কুণ্ঠভাবে বলতে পারে। আবার তার কাছেই নিজের নীচতা-হীনমন্যতার স্বীকারোক্তিও করে — যদিও জানে রোশ্‌নি মানসিক স্তরে তার সমমানের নয়। এ যেন জড় পদার্থের কাছে মাথা ঠোকা। রোশ্‌নি শুধু মমতা দিয়ে নীরজার শারীরিক বেদনা ও মানসিক যাতনাটুকু বোঝে। হলামালী স্বার্থপর লোভী ও মতলবী চরিত্র। সরলা ও নীরজার দ্বন্দ্ব সে নিজের মতো করে বুঝে নিয়েছে। এরই ফয়দা সে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করতে ছাড়ে না। মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা স্বল্পরেখায় মুক্তি পেয়েছে এমন ক্ষুদ্র চরিত্রসৃষ্টিতে।

৩০২.১.২.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'মালঞ্চ' উপন্যাসের 'নারী' চরিত্রের মধ্যে ঔপন্যাসিকের কী মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে তা লেখো।

২। উপন্যাসে নীরজা চরিত্রটি কতটা বিশিষ্টতা আলোচনা করো।

৩। উপন্যাসের মুখ্য ও গৌণ চরিত্রগুলির সুষ্ঠু বিন্যাস করো।

৩০২.১.২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য — বুদ্ধদেব বসু

৪। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৫। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক (৩য় খণ্ড) — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৬। রবীন্দ্রনাথ — সুবোধ সেনগুপ্ত

৭। রবীন্দ্রমনন — রথীন্দ্রনাথ রায়

৮। রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন — অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

৯। রবীন্দ্র উপন্যাস-সমীক্ষা — সত্যব্রত দে

১০। রবীন্দ্র উপন্যাস নির্মাণ শিল্প — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক - ৩

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.১.৩.১ : 'মালঞ্চ' কি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস
৩০২.১.৩.২ : 'মালঞ্চ' কি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা যায় কিনা
৩০২.১.৩.৩ : 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নাট্যধর্ম
৩০২.১.৩.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৩০২.১.৩.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০২.১.৩.১ : 'মালঞ্চ' কি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

রবীন্দ্র উপন্যাসমালায় শেষ পর্বে চয়িত কুসুমগুলির মধ্যে 'মালঞ্চ' পড়ে। প্রায় সমকালে রচিত 'দুই বোন' এবং এ-দুটি উপন্যাসের আগের রচনা 'শেষের কবিতা' আর প্রায় সমসাময়িক 'চার অধ্যায়' - সব কটি লেখাই পরিসরে বৃহৎ নয়। মানবমনের বিচিত্র বৃত্তিগুলিকে নিয়ে বহু চরিত্রের ও আখ্যানের শাখাপ্রশাখার সমাবেশ ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, ঘরে বাইরে বা যোগাযোগের মত বৃহদায়তন উপন্যাস ইতিপূর্বে রচনা করেছেন। তুলনামূলক দৃষ্টিতে লক্ষ্য না করে তাঁর শেষ পর্বের একখানি ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস মালঞ্চ সম্পর্কে আমরা নিরপেক্ষ বিচার করতে পারি।

'মালঞ্চ' উপন্যাসের মূল সমস্যা নীরজার। স্বামীর পূর্বপরিচিতাকে নিজের অস্তিত্বের প্রতিস্পর্ধী শক্তিশালী ভূমিকায় আবিষ্কার করে নীরজা ঈর্ষাতুর হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে তার ঈর্ষার ইন্ধনে সে নিজে যেমন পুড়ে ছাই হয়েছে, তেমনিই তার পরিপার্শ্বও ঝল্‌সে গেছে। অসুস্থ নীরজা মৃত্যুকে শিয়রে নিয়েও কোনও প্রশান্ত উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এই মানবিক পরাজয়ের তীব্র দহনময় চিত্র রবীন্দ্রনাথ যে বাস্তবাতাবোধ থেকে উপহার দিয়েছেন, রবীন্দ্রসাহিত্য তার দৃষ্টান্ত বিরল।

'মালঞ্চ' এর মূল বক্তব্য উপন্যাসের গঠনের দিক থেকে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য। অপ্রতুল হলেও চরিত্রসংখ্যা তাদের বৈচিত্র দিয়ে উপন্যাসের দাবি পূরণ করতে সমর্থ। কিন্তু উপন্যাসটির একমাত্র অতৃপ্তির জায়গা তার বিন্যাস তথা উপস্থাপনা কৌশলে। স্পষ্ট কথায় - অতি দ্রুত, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে উপন্যাসটিকে শুরু করা হয়েছে, পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অসুস্থ নীরজা রোগশয্যায় - এই বর্ণনার সূত্রে তার অতীত-বর্তমান

লেখক নিজের বিবৃতি থেকেই তুলে ধরেছেন। ফলে উপন্যাসে প্রত্যাশি ব্যাপক-বিস্তৃত পটভূমিতে আমরা প্লটটিকে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে দেখি না। নীরজার প্রাক্-বিবাহ জীবনে একেবারেই অব্যক্ত, বিবাহিত জীবনের কেটে-যাওয়া দশ বছরও নেপথ্যে থেকে গেছে। ঠিক তেমনি করেই সরলা-আদিত্যর বাল্য-কৈশোর সম্পর্কে পরস্পরের সংক্ষিপ্ত সংলাপের মধ্যে থেকে পাঠককে জানতে হয়। অথচ এই সময়ে উভয়ের সম্পর্কের একটা বিশ্বাস দলিল উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্ব-জটিলতার প্রেক্ষিতরূপে পাঠকের জ্ঞাত থাকা নিতান্ত জরুরী ছিল। ঘটনাকে উপন্যাসোচিতভাবে ধীরে ধীরে পল্লবিত করার পরিবর্তে আদিত্যর মানস পরিবর্তনের সূত্রগুলি বাদ দিয়েই তাকে সরলার প্রণয়ী রূপে আত্মপ্রকাশ করতে দেখি। তেমনই দ্রুততায় সরলাকে কারাবাসে পাঠিয়ে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে। লেখকের সমকালীন মানসিক অবস্থানই এর কারণ। উপন্যাসের উপযুক্ত প্লট ও চরিত্রসৃষ্টি সত্ত্বেও দ্রুততা ও অতিসংক্ষেপণের কারণে 'মালঞ্চ' অভিহিত হয়ে থাকে ছোট উপন্যাস বলে।

৩০২.১.৩.২ : 'মালঞ্চ' কি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা যায় কিনা

আধুনিক কালের সৃষ্টি উপন্যাস স্বভাবতই যুগলক্ষণাক্রান্ত। সমকালীন জটিলতাপূর্ণ জীবন উপন্যাসের আঙ্গিকে বিচিত্র রঙে-রসে রূপায়িত হয়েছে। মানবমনের গহনচারণায় সব উপন্যাসেই কমবেশি আলোকপাত ঘটে থাকে। তাই কোনও উপন্যাসকে বিশেষভাবে মনস্তাত্ত্বিকতার গুণসম্পন্ন বলা সঙ্গত কিনা এ প্রশ্ন উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে মূল প্রস্তাবের পক্ষে এই যুক্তি হয়তো খাটে যে অন্যান্য সাধারণ উপন্যাসের তুলনায় যেসব উপন্যাসে বাস্তব ঘটনাসংঘাতের চেয়ে মনের রহস্যময় অভিচারণা লেখকের কাছে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে; কিম্বা মনোলোকের অতলস্পর্শ অনুভূতি বা অভিপ্রায় যেখানে প্রাধান্য পায়, উপন্যাসের অগ্রগতি - ক্রমবিকাশ তারই প্রভাবে পরিচালিত হয়, - মূলত সেই মনোজীবন নিয়ন্ত্রিত উপন্যাসকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা যেতে পারে।

'মালঞ্চ' উপন্যাস রচনার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ 'মনের সংসারের কারখানা ঘরে' অবতীর্ণ হবার কথা শুনিয়ে রেখেছিলেন। চোখের বালি, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, যোগাযোগ বা দুই বোন মসস্তত্ত্ববিশারদ হিসেবে তাঁর সাফল্যকেই প্রমাণিত করে।

ব্যক্তিজীবনে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীসমেত বহু প্রিয়জনের মৃত্যুর করুণ সাক্ষী হয়ে থেকেছেন। একজনকে তার জ্ঞাতসারে চিরকালের মতো পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে একথা জানলে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, তার স্রষ্টা ভালো করেই বুঝতে পারতেন। 'মালঞ্চ'-এর নীরজার মনে এই বোধ শূন্যতার বেদনা বহন করে এনেছিল। কিন্তু যখন সে বুঝেছে সে তার শূন্যস্থানটি অচিরেই ভরাট করতে অন্য এক নারী প্রস্তুত, তখন তার নিঃস্বতার যন্ত্রণা তার মনের রাজ্যে ঝড় তুলে দিল। এতে তার নিজের যেমন অস্বস্তি ও অসুস্থতা বেড়ে গেল, তেমনই তার পরিজনেরাও বিভ্রান্তির আঁধারে পথ হারাল। বিশেষত তার স্বামী আদিত্য। নীরজার মনে ঘনিয়ে ওঠা ঈর্ষা উপন্যাসের মূল সঙ্কট বা সমস্যার বীজ উপ্ত করেছে। পূর্বপরিচিতা সরলা সম্পর্কে আদিত্য নতুন করে অন্য এক ভাবানুভূতি থেকে মূল্যায়ন করেছে। দশ বছরের বিবাহিত স্ত্রী নয়, সরলাই যে তার প্রকৃত ভালোবাসার পাত্রী, নীরজাই তার এই সত্যকে চিনিয়ে দিয়েছে। এতদিনে আদিত্য বুঝেছে, তারই জন্য সরলা

অন্যপাত্রে বিবাহ রাজি হয়নি। এরপর স্বামীর প্রতি আর তার বাগানের প্রতি আত্যন্তিক অধিকার হারাতে বসে নীরজার মনের স্থিতি টলে গেছে। দেবর রমেনের শত চেষ্টাতেও সে প্রশান্তমনে সরলাকে সব কিছু দান করে যেতে পারেনি। তার মনের চেতন-অর্ধচেতন অবচেতন স্তরগুলি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবেই বর্ণিত হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তার পক্ষে অসম্ভব এক সংকল্প যখন সে গ্রহণ করছে— 'জ্ঞানে অজ্ঞানে জড়িত বিহ্বল মুখ' তার। এবং শেষ দৃশ্যে সরলাকে দেখে তার বিকারগ্রস্ত মনের আক্ষেপ, তীব্র স্নায়বিক চাপে মৃত্যু কোলে এলিয়ে পড়া সবটুকুই মনোবিজ্ঞানীর পর্যালোচনার বিষয় হবার মতো। অন্যদিকে আদিত্যের আত্মাবিষ্কার এবং 'তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে' — এই পুলকিত বিস্ময়ের আবেগ, সরলার সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগব্রত সাধনা, অথচ উন্মোচিত সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া বা অস্বীকার না করার দৃঢ়তা - সমস্ত দিক থেকে প্রতিটি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ উপন্যাসে যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থিত। অন্যান্য চরিত্র - রমেন, আয়া রোশ্‌নি বা হলামালী — এরা সকলেই মূল চরিত্রের মানসলোকে উদঘাটনে কোনো না কোনোভাবে সহায়তা করেছে। তাই, পরিণত অভিজ্ঞতা নিয়ে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ 'মালঞ্চ' উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক জগতের রহস্যময় দিকগুলির অন্বেষণ ও রূপায়ণে আগ্রহী হয়েছিলেন এমনই মনে হয়।

৩০২.১.৩.৩ : 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নাট্যধর্ম

কোনও উপন্যাসের সম্পর্কে তার নাট্যধর্মিতার কথা উঠলে তা অনেকটা 'সোনার পাথরবাটি'র মতো শোনাতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে তাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্ত আমাদের স্মরণে রাখা জরুরী। তা হলো, উপন্যাস সর্বরসসিদ্ধ। ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে কাব্য ও নাট্যধর্মকেও সে প্রয়োজন অনুসারে অক্লেশে গ্রহণ ও ধারণ করতে পারে।

নাটক রচনায় সংলাপনির্ভরতা, দৃশ্যসংস্থানগত উপস্থাপনা, অধিক পাত্রপাত্রীর স্থলে স্বল্পসংখ্যক চরিত্রের অবতারণা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে নাট্যকারকে সতর্ক থাকতে হয়। উপন্যাসিকের জন্য এগুলি তেমন জরুরী নয়। 'মালঞ্চ' উপন্যাসের ক্ষুদ্রায়তনে চরিত্র সংখ্যা নিতান্তই অঙ্গুলিমেয়। বর্ণনার তুলনায় লেখক বেশি ব্যবহার করেছেন সংলাপ। নীরজার স্মৃতিচারণা ছাড়া আর সমস্ত সংলাপই ছোট, নাট্যোপযোগী। নাটকে যেমন সমস্যার উপস্থাপনা, তার জটিলতার তীব্র থেকে তীব্রতর রূপগ্রহণ এবং শেষে ভাবমোক্ষণে পরিণতি— মালঞ্চের আদি-মধ্য অন্ত সমন্বিত প্লটে এই সমস্ত দিকগুলিরই পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের বিবৃতিধর্মিতার স্থানে অতি সংক্ষেপিতকরণের একটি প্রবণতা যেন কিছুটা নাট্যধর্মকে আশ্রয় করেছে বলে সমালোচকদের মনে হয়েছে। আবার একটি দৃশ্যকে যেভাবে নাট্যকার উপস্থিত করেন দর্শকের সামনে, তেমনি অনুপুঙ্খ দিয়ে মঞ্চদৃশ্যই যেন সজ্জিত হয়ে উঠে এসেছে এই উপন্যাসের পাঠকের সামনে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের উল্লেখ করা যেতে পারে। নীরজার আত্মদ্বন্দ্ব এবং অন্তর্দাহ যথার্থই নাট্যদ্বন্দ্বের উপযোগী। সে-তুলনায় আদিত্যের দ্বন্দ্বপ্রকাশে লেখক যত্নবান হয়েছেন কম। মূল চরিত্র হিসেবে নীরজা যতখানি সার্থক, তার অনেকটাই এই কারণে যে, সে নাট্যিক দ্বন্দ্বময়তা দ্বারা একটি বাস্তব চরিত্রসৃষ্টি হয়ে উঠতে পেরেছে। ঐক্য ও সংহতি উপন্যাসটিকে অনেক শৈথিল্য থেকে রক্ষা করেছেন ঠিকই, তবে উপন্যাস পাঠকের প্রত্যাশা একই কারণে কোথাও কোথাও অপূর্ণ তেকে গেছে। উপন্যাসের শেষ অংশটিকে নাটকের শেষ দৃশ্য বলা যেন অধিক সঙ্গত

বলে মনে হয়। নীরজার মৃত্যুদৃশ্যের কঠোরতা মনে পড়ায় 'মালিনী' নাটকের হত্যাদৃশ্যের নিষ্ঠুরতা। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে নীরজার জীবন্ত মুহূর্তটির তুল্য দৃশ্য কমই আছে। এতে নাটকীয় চমক থাকলেও তা কার্য-কারণসূত্রের বাইরে থেকে আরোপিত হয়নি।

আর একটি প্রাসঙ্গিক তথ্যের উল্লেখ এই আলোচনায় প্রয়োজনীয়। তা হলো, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'মালঞ্চ' উপন্যাসটিকে এক সময় নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী (১৯৭৩) র দ্বাদশ খণ্ডে উল্লেখিত আছে যে, ''সম্পূর্ণ নাটক পাণ্ডুলিপি আকারে রবীন্দ্র ভবনে রক্ষিত ছিল, বর্তমানে (অগ্রহায়ণ ১৩৭৫) বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে।'' (পৃ.৬০৯) 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নাট্য সম্ভাবনা স্বয়ং স্রষ্টা কর্তৃকই যে উপলব্ধ ছিল তার প্রমাণ তাঁর স্বহস্তরচিত এই উপন্যাসের নাট্যরূপান্তর।

৩০২.১.৩.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'মালঞ্চ' উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে প্রকাশিত লেখকের মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দাও।

২। 'মালঞ্চ'কে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা যায়—বিচার করো।

৩০২.১.৩.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য — বুদ্ধদেব বসু

৪। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৫। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক (৩য় খণ্ড) — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৬। রবীন্দ্রনাথ — সুবোধ সেনগুপ্ত

৭। রবীন্দ্রমনন — রথীন্দ্রনাথ রায়

৮। রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন — অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

৯। রবীন্দ্র উপন্যাস-সমীক্ষা — সত্যব্রত দে

১০। রবীন্দ্র উপন্যাস নির্মাণ শিল্প — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক - ৪

নামকরণ

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.১.৪.১ : 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নামকরণ

৩০২.১.৪.২ : 'মালঞ্চ' উপন্যাসের পরিণাম কতটা স্বাভাবিক

৩০২.১.৪.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০২.১.৪.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০২.১.৪.১ : 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নামকরণ

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস থেকে তাঁর জীবনে বেশ কয়েকটি ফুলবাগানের প্রভাব সম্পর্কে জানা যায়। তার মধ্যে বউ ঠাকরুণের সৃষ্টি ছাদের বাগান যেমন আছে, তেমনি আছে পেনেটির ছাতুবাবুদের বাগান, মেজদাদার কাছে বেড়াতে গিয়ে দেখা আমেদাবাদের শাহীবাগ, চন্দননগরের মোরান সাহেবের বকুলবীথিকা, গাজীপুরের গোলাপ বাগিচা থেকে শিলাইদহের কুঠিবাড়ির বাগান, বোম্বাইয়ের অন্না তড়খড়ের বাড়ির বাগিচা, বিদেশের বিভিন্ন বাগানের কথা। তেমনই রবীন্দ্রসাহিত্যে অজস্র ফুল- দেশ-বিদেশি সম্ভার থেকে অনায়াসে এসে জায়গা নিয়ে সৌন্দর্যবর্ধন করেছে।

'মালঞ্চ' শব্দের মানে বাগান-মূলত ফুলবাগান। নায়ক আদিত্যের মালঞ্চ তার জীবন ও জীবিকার কেন্দ্রস্থল। তেমনই উপন্যাসের প্রেক্ষিত রচনায় মালঞ্চের ঘনিষ্ঠ ও তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান। ''উপন্যাসটির পরতে পরতে সুগন্ধি পুষ্পের সৌরভ, শ্রীময়ী উদ্ভিদের বর্ণচ্ছটা এবং চারুপর্ণী উদ্ভিদের চিত্রপট অনুপম সুষমায় মণ্ডিত। ফুলের বর্ণে গন্ধে, বক্ষঃস্পন্দনে মদির আবেগে আদিত্য ও নীরজার প্রেম বিকশিত, নিয়মিত ও ঘনীভূত হয়েছে। নীরজার সযত্নলালিত কুসুমোদ্যান সেই প্রেমের প্রতীকী নিদর্শন''।

সংসারজীবনে প্রবেশ করার আগে আদিত্য তার মেসোমশায়ের কাছ থেকে বাগানের কাজে শিক্ষানবিশী করে দক্ষ হয়েছে। মেসোমশায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী সরলাও ছিল তার সহশিক্ষার্থী। বিবাহের পরদিন থেকেই স্ত্রী নীরজা স্বামীর অনুরাগের স্থান মালঞ্চকে আপন করেছে। নীরজার জীবনসংশয় রোগে বাগান ও সংসার বাঁচাতে সরলাকে আনিয়ে নিয়েছে আদিত্য। এখানেই দেখা গেছে মৃত্যুশয্যাশ্রয়ী নীরজার ঈর্ষা-বিকার। বাগানের প্রসঙ্গে বারবার

এসেছে অকির্ডের কথা। এই পরজীবী উদ্ভিদের বিষয়টি লেখক প্রতীকের মত ব্যবহার করেছেন। বিয়ের দশ বছর পর নীরজা বুঝি বুঝতে পারছে তার অস্তিত্ব আজ শুধু পরনির্ভর হয়ে উঠেছে তাই নয়, কোনোকালেই সে স্বমহিমায় তার বাগান ও সংসারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তাই প্রতিদ্বন্দ্বিনী সরলার বিরুদ্ধে স্বামীপ্রেম ও স্বহস্তরচিত ফুল-ফল-সব্জি বাগিচার ওপরে নিঃসপত্ন্য অধিকার অক্ষুন্নরাখার জন্য তার মর্মান্তিক প্রয়াস। কাহিনির 'পরিণতিতে যদিও নারী-হৃদয়েরএকটি বিশিষ্ট বৃত্তির প্রকাশই মুখ্য' কিন্তু মালঞ্চের প্রভাব এই উপন্যাসে সর্বাতিশায়ী হয়ে রয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে লেখক এক স্নিগ্ধ কাব্যময়তার আবেগ কবিজনোচিতভাবেই সৃষ্টি করেছেন। মালঞ্চের বিচিত্র পত্রপুষ্প সমাবেশের ভেতর থেকে উঠে এসেছে 'প্রখর অন্তর্দাহময়, তীব্র দ্বন্দ্বজর্জর মানসসংকট। বাংলা কথা সাহিত্যের জগতে এর মূল্য অভিনবত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র অবিনাশ চরিত্রটিও তার বাগানপ্রিয়তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত। 'মালঞ্চ' উপন্যাসে মালঞ্চের সার্বিক অস্তিত্ব এবং ভূমিকার দিক থেকে দেখলে উপন্যাসের নামকরণ যথার্থ হয়েছে বলেই মনে হয়।

৩০২.১.৪.২ : 'মালঞ্চ' উপন্যাসের পরিণাম কতটা স্বাভাবিক

রাবীন্দ্রিক মঙ্গলচেতনা ও শুভদ প্রেরণার পরিপ্রেক্ষিতে 'মালঞ্চ' উপন্যাসের পরিণতিতে মুখ্য চরিত্র নীরজার জীবনান্তকালীন তীব্র ও প্রখর অন্তর্জ্বালাময় অভিব্যক্তি কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। নীরজার মতো রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট অনেক চরিত্রেরই মৃত্যুপরিণতি দিয়ে লেখা শেষ হয়েছে। ডাকঘর ও বিসর্জন নাটক, মধ্যবর্তিনী বা শেষের রাত্রি গল্পের কথা আমাদের মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু এই লেখাগুলির সঙ্গে 'মালঞ্চ' উপন্যাসের কিছুটা গুণগত পার্থক্য রয়েছে।

আদিত্য ও নীরজার মাঝখানে তাদের সুখী দাম্পত্যে কোথাও ফাটল ধরার সম্ভাবনাও দেখা দেয়নি। অন্তত আদিত্যের মনে তো নয়ই। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রিণী যখন সরলার প্রতি আদিত্যের হৃদয়ে লুকোনো ছবির কথা বারে বারে তুলে তাকে বিদ্ধ করতে থাকল, তখন সেই আঘাতের বেদনা থেকে উঠে এল সেই আসল সত্য। আর নীরজা যখন সুস্থ ছিল তখনকার কিছু স্মৃতি ভেসে এলে আদিত্যের মনে —স্পষ্ট মনে পড়ল, ইংরেজি বই খুঁজে খুঁজে নীরজা মুখস্থ করে রাখত অপরিচিত ফুলের উদ্ভট নাম; ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করত সরলাকে, যখন সে ভুল করত, তখন থামতে চাইত না ওর হাসির হিল্লোল; 'ভারি পণ্ডিত, কে না জানে ওর নাম ক্যাসিয়া জাভানিকা। আমার হলামলীও বলতে পারত'। (৪র্থ পরিচ্ছেদ) এর থেকে বোঝা যায় নীরজার ছিল যে-কোনো উপায়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাবার উগ্র আকাঙ্ক্ষা। সে যতখানি না ভালোমানুষ, তার চেয়ে 'ভালোমানুষের মতো'। নারীর সহজাত প্রজ্ঞায় সে বুঝেছিল আদিত্য ও সরলার অন্তর্লোকে এমন একটা সদৃশতর সমঝোতা আছে যা নিরুচ্চার - কিন্তু যাকে নীরজা কোনদিন ছুঁতে পারবে না। তারপর এমন একসময় এল, যখন নিয়তিপ্রেরিত দুর্ভাগ্যের বোঝা গ্রাস করল তাকে। সরলা না চেয়েও নীরজার স্বামী আর বাগানের দায়দায়িত্ব পেয়ে গেল। নীরজা জানে তাকে যেতে হবে সব ছেড়ে- কিন্তু তার অহংচেতনা তা মেনে নিতে পারে না। তার দেওর রমেন তার মনকে আশ্বস্ত করার পথ বলে দেয়। স্বামীকে একথানি ভলোবাসে বলেই নীরজা স্বামীরই জন্যে নিজের সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়। আমিত্বের অনপনেয় ভারটি থেকে মুক্ত করে নিতে চায় সে নিজেকে মৃত্যুর আগে। প্রথম প্রচেষ্টায় দিতে যায় সরলাকে তার মুক্তার মালা। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতেই নীরজার দীনতা বেরিয়ে পড়ে- 'আমার হয়ে মালা

তুমিই পরে থেকো শেষ দিন পর্যন্ত। বিশেষ বিশেষ দিনে এ মালা কতবার পরেছি সে তোমার দাদা জানেন। তোমার গলায় থাকলে সেই দিনগুলি ওর মনে পড়বে।' এতে নীরজার মহত্ব নয়, তার অন্তরতর মনের জ্বালাই এই দানের মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

এই সমস্ত ধারাবাহিক যুক্তিশৃঙ্খলা মান্য করেই 'মালঞ্চ'-এর উপসংহার রচিত হয়েছে। মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে নীরজা সরলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। 'জ্ঞানে অজ্ঞানে জড়িত বিহ্বল মুখ'। বিড় বিড় করে যেন মন্ত্র জপ করছে —'দেব, দেব দেব, সব দেব'। কিন্তু সরলা ঘরে ঢুকে তাকে 'প্রণাম করবার জন্য পায়ে হাত দিতেই যেন বিদ্যুতের আঘাতে ওর সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পা দ্রুত আপনি গেল সরে। ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।' সরলাকে জায়গা ছেড়ে দিতে পারব নীরজা। এত চেষ্টা এত মানসিক প্রস্তুতি ব্যর্থ করে বেরিয়ে এল মানবাত্মার পরাজয়ের চরম চেহারা। ''হঠাৎ ঢিলে-শেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণমূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, 'পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।' বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।

নিদারুণ নিষ্ঠুরতার কঠিন মর্মদাহী এই রূপ নীরজার আদ্যন্ত চরিত্র লক্ষণের সঙ্গে বেমানান হয়নি। 'ডাকঘর' বা 'শেষের রাত্রি'-র মৃত্যুর বিষাদ কারুণ্যের থেকে অন্যতর এক অভিব্যঞ্জনা নিয়ে মৃত্যু এসেছে 'মালঞ্চ' উপন্যাসের পরিণামে। এতে মানবতাধর্ম হয়তো জয়ী হয়নি। কিন্তু রক্ষিত হয়েছে বস্তুচেতনাজাত এক প্রখর নির্মম সত্যদর্শন। এই পরিণাম কোনোমতেই অতিনাটকীয় বা মেলোড্রামটিক নয়। রবীন্দ্রমনন ও দর্শনে, তাঁর উপলব্ধিতে নিষ্ঠুর জীবনাভিঘাতের দৃশ্যের স্বল্পতা সম্পর্কে অনেকের অভিযোগ আছে। আদর্শায়িত জীবনানুভব এবং জীবনায়নই শুধু নয়, রবীন্দ্রমানসে সত্যের নিষ্করুণ তীক্ষ্ণ রূপও যে কত সহজভাবে ধরা আছে তার প্রমাণ তাঁর কিছু চিত্রকলায়, সাহিত্যলোকে অবশ্যই 'মালঞ্চ'-উপন্যাসে। তাই এই উপন্যাসের পরিণাম নিয়ে অভিযোগ খাটে না। অভিযোগের উদ্যত অঙ্গুলি একটি দিককেই শুধু নির্দেশ করে। তা হলো উপন্যাসটির কাহিনি বিন্যাসে অতি-সংক্ষিপ্ত। ঘটনাকে জীবন সদৃশ ও প্রত্যয়সিদ্ধ করে তুলতে হলে যে 'ডিটেল্‌স্' এর একান্ত প্রয়োজন, তার অভাব'।

৩০২.১.৪.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বে রচিত উপন্যাস হিসেবে 'মালঞ্চ'-এর গুরুত্ব বিচার করো।

২। আয়তনে ক্ষুদ 'মালঞ্চে'র উপন্যাসধর্ম রক্ষিত হয়েছে কিনা আলোচনা করে দেখাও।

৩। 'মালঞ্চ' উপন্যাসটিকে মনস্তত্ত্বধর্মী উপন্যাস বলার পক্ষে তোমার যুক্তি প্রদর্শন করো।

৪। 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নাট্যগুণের সমাবেশ লক্ষিত হয়। — মন্তব্যটি বিশদ করো।

৫। 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নীরজা চরিত্রটি রবীন্দ্রসৃষ্ট চরিত্র হিসেবে কোথায় বিশিষ্টতার অধিকারী তা বিশ্লেষণ করো।

৬। 'মালঞ্চ' উপন্যাসের আদিত্য চরিত্রটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতো যদি তার অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপায়ণ থাকতো। — আদিত্য-চরিত্রটি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মন্তব্যের সারবত্তা বুঝিয়ে দাও।

৭। 'মালঞ্চ' - এর সরলা স্বাতন্ত্র্যময়ী, নবযুগের ভাবনায় গড়া। — মন্তব্যটি বিচার করো।

৮। 'মালঞ্চ' উপন্যাসের গৌণ চরিত্রগুলির ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার অভিমত দাও।

৯। 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নামকরণ যথাযথ হয়েছে কিনা বিচার করো।

১০। 'মালঞ্চ' উপন্যাসের পরিণাম কি শিল্পসঙ্গত হয়েছে? এ বিষয়ে তোমার অভিমত যুক্তিসহ লিপিবদ্ধ করো।

৩০২.১.৪.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য — বুদ্ধদেব বসু

৪। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৫। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক (৩য় খণ্ড) — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৬। রবীন্দ্রনাথ — সুবোধ সেনগুপ্ত

৭। রবীন্দ্রমনন — রথীন্দ্রনাথ রায়

৮। রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন — অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

৯। রবীন্দ্র উপন্যাস-সমীক্ষা — সত্যব্রত দে

১০। রবীন্দ্র উপন্যাস নির্মাণ শিল্প — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

পর্যায় গ্রন্থ - ২

মানুষের ধর্ম

একক - ৫

ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.২.৫.১ : উপস্থাপনা : ধর্মকেন্দ্রিক বিশ্ব পরিস্থিতি

৩০২.২.৫.২ : ধর্মচেতনার উদ্ভব

৩০২.২.৫.৩ : মানবজীবনে ধর্মের প্রয়োজন

৩০২.২.৫.৪ : ধর্মের বিচিত্র স্বরূপ

৩০২.২.৫.৫ : এসো ধম্মো সনাতনো

৩০২.২.৫.৬ : রিলিজিয়ন

৩০২.২.৫.৭ : ইসলাম

৩০২.২.৫.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০২.২.৫.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০২.২.৫.১ : উপস্থাপনা : ধর্মকেন্দ্রিক বিশ্ব পরিস্থিতি

বর্তমান বিশ্বে ধর্মকে কেন্দ্র করে বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য ধর্ম নিয়ে জিগির কেবল আজকের নয়। সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় আপনাপন ধর্মাদর্শকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করবার জন্য ফতোয়া জারি করে পরস্বাপহরণে লিপ্ত হয়েছে। প্রাচ্য দেশে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ এবং পাশ্চাত্যে ক্রুসেড্ এর জ্বলন্ত উদাহরণ। কিন্তু ধর্ম বিষয়টি আসলে কি, তার অক্ষরার্থ ও অন্তর্নিহিত ভাবব্যঞ্জনাই বা কি, সমাজজীবনে তার গুরুত্বই বা কতখানি এসব নিয়ে গভীর আত্মনিমগ্নতার ও আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে নতুন করে।

৩০২.২.৫.২ : ধর্মচেতনার উদ্ভব

আমরা জানি, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুষ্ঠু কৌম জীবন-যাপনের আকাঙ্ক্ষায় অনৈসর্গিক শক্তিগুলি দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ এককালে তাদের স্তুতি করেছিল। স্বভাবতঃই কল্পিত হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন শক্তির অধিকারী বিভিন্ন দেব-দেবীর। ভারতবর্ষে হিন্দু লোকানুভবে এই সব দেবদেবীর সংখ্যা তেত্রিশ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তৎসত্ত্বেও প্রাচীন আর্য-মুনি-ঋষিদের আত্মানুভবে বিশ্বসৃষ্টি ও মহাবিশ্ব-পরিমণ্ডলের পশ্চাতে একজন স্রষ্টার (ব্রহ্মার) কল্পনা সমুজ্জ্বলিত হয়েছিল। ঈশ্বর এক ও অনন্তশক্তির উৎস- এই অনুভব থেকে গড়ে উঠেছিল একেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদ (Monotheism)। মহাবিশ্বে-মহাকাশে এক অক্ষর-প্রশাসনের অখণ্ড-অক্ষয় ঐক্যবোধের কথা তাঁরা জেনেছিলেন - 'এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি' (বৃহদারণ্যক ৩/৮/১১)। পরবর্তীকালে ঈশ্বর ও সৃষ্টিসম্পর্কিত জটিল মানবিক জিজ্ঞাসার সরল সমীকরণরূপে গড়ে উঠেছিল ত্রিমূর্তিবাদ - সৃজন পালন ও বিনাশের তিন অধিকর্তা — ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের রূপকল্পনা। 'একোহহং বহুস্যাম্' — এক থেকে বহুর এই কল্পনা উত্তেরোত্তর পল্লবিত-বিচারিত ও সংশ্লেষিত হয়ে ক্রমান্বয়ে দ্বৈত, বিশিষ্ট্যদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত অচিন্তভেদাভেদ ও সর্বেশ্বর প্রভৃতি মতবাদের মধ্যে পরিণতি লাভ করেছিল।

৩০২.২.৫.৩ : মানবজীবনে ধর্মের প্রয়োজন

সুতরাং বোঝা গেল, ব্যবহারিক দিক ছাড়াও ধর্মের একটা দার্শনিক প্রেক্ষিত আছেই। এই পটভূমিটুকু আছে বলেই 'ধর্ম' শব্দটি বুদ্ধিক ও আনুভবিক তাৎপর্যে সমুজ্জল হয়ে যুগে যুগে মানুষকে-বৈষম্যের পথ পরিহার করে শান্তি ও সামঞ্জস্যের ধ্রুবলোকে চালিত করেছে। ধর্মের প্রায়োগিক ও প্রায়োজনিকতাৎপর্য বোধ করি এখানেই। মানুষের বিচিত্র সংঘাতমুখর প্রয়োজন, জটিল আশা-আকাঙ্ক্ষা-অগ্রতি ও পরিবর্তন - এককথায় জীবন ও জীবিকার সঙ্গে ওতঃপ্রোত হয়ে রয়েছে ধর্ম। এই ধর্ম মানুষকে একদিকে যেমন পারমার্থিক প্রয়োজন একটা কিছু উপলব্ধির প্রান্তসীমায় পৌঁছে দেয়, তেমনি বাস্তব জীবনকেও অস্বীকার করে না। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনগুলিকে উপেক্ষা রা যেমন চলে না, তেমনি অধি-আত্মিক জীবনের আকর্ষণকেও ঠেকিয়ে রাখা যায় না। একজন হিন্দুর কাছে 'ধর্ম' তাই বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের চাহিদা সম্পূরক ধমার্থকামমোক্ষপ্রদ চতুর্বর্গ।

আমাদের সংস্কারে 'ধর্ম' শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত। সংগ্রামশীল মানুষের আশা-আকাঙক্ষা-প্রয়োজন, জীবন-জীবিকার সর্বস্তরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই ধর্ম। পঞ্চকোষ ও পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট মানুষের জীবন চরিতার্থ হয় তা আধিভৌতিক তথা পারমার্থিক প্রয়োজন সাধনের মধ্যে। চতুর্বর্গ ফল-প্রাপ্তির দ্বারা এই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। 'ধর্ম' তাই জীবনকে দেখে পূর্ণতা ও সমগ্রতার মধ্যে নিবিষ্ট করে।

জীবন তো একটাই। এখানে পবিত্রতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার, ভুক্তি ও মুক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এখানে ধর্ম-অর্থ ও কাম হাত ধরাধরি চলে। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে —

"শ্রতং বহুবিধং ধর্মম্ ইহামূত্রসুখপ্রদম্।
ধর্মার্থকামদং বিঘ্নহরং নির্বাণকারণম্।"

পরস্পরবিরোধী এই কথার সূত্রে জিজ্ঞাসু শিষ্য তোলেন —

''ধর্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ পরস্পরবিরোধিনঃ।

এষ্যাং নিত্যবিরুদ্ধানাং কথম্ একত্র সমাগমঃ?''

উত্তরে গুরু বলেন—

''যদা ধর্মশ্চ ভার্যা চ পরস্পরবশানুগৌ।

তদা ধর্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গমঃ।''

অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম একসঙ্গে চলে।

আসলে মানুষের ভৌতজীবনের যা কিছু কৃতাকৃত তা পরিণামী সত্যের প্রতি তথা ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত। ব্যক্তি জীবনের লাভালাভেরচেয়ে সমাজ জীবনের কল্যাণ-এষণা অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত বলেই শরীর রক্ষার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাকে ধর্মবোধ দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলতে হয় - 'শরীরং ধর্মসর্বস্বং রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ।' আসল কথা, ঐ সমগ্রতাই জীবনের ধর্ম। তাই ধর্মপালনের জন্য ধর্ম-অর্থ ও কাম - জীবনের এই অপিরহার্য ত্রিবর্গকে স্বীকার করতেই হয় - ''ধর্মার্থকামঃ সমবেম সেব্যঃ। যো হি একসক্তঃ সো জনো জঘন্যঃ।। (মহাভারত/শান্তি ১৪০-১৬৭)। অর্থাৎ ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্বর্গ পালনের মধ্যেই ধর্মের পূর্ণতা।

কিন্তু ধর্মপালনের আপাতত লক্ষপূরণে সদা নিয়োজিত থেকেও ধর্মের অন্তর্নিহিত শ্রেয়োবোধকে বিসর্জন দিলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, মানবশক্তির মর্যাদা, মানবমহিমার মহত্বের কথা। মনে রাখতে হবে, এই জীবশরীরেই পরাশক্তির (Supreme Force) বিচিত্র প্রকাশ - 'Poor body is the temple of living God' ।এই মানবহৃদয় ঈশ্বরের বাসস্থান, তাঁর লীলাক্ষেত্র' - এই বোধকেই বলে ধর্ম—

''ভগবান বাসুদেবোহি সর্বভূতেষু ব্যবস্থিত)।

এতদ্ জ্ঞানং হি সর্বস্যং মূলং ধর্মস্য শাশ্বতম্।''

এই ধর্ম পালনীয় আচরণীয়। কারো কোনো ক্ষতি করা নয়, কাউকে পীড়িত করা নয়, কায়মনোবাক্যে সর্বভূতের কল্যাণ কামনা ও সৌহৃদ্য ধর্মের পরম লক্ষ্য—

''সর্বেষৎ যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্বেষাং চ হিতে রতঃ।

কর্মণা- মনসা বাচা স ধর্মং বেদ জাজলে।।''

(মহাভারত শান্তি ২৬১/৯)

এই ধর্মভাবনায় আত্মতৃপ্তির ভাবটিও মহাভারতকারের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি—

''অদ্রোহঃ সর্বভূতানাং কর্মণা-মনসা-গিরা।

অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্মঃ সনাতনঃ।।''

(মহা. শান্তিপর্ব ২৬১/৯)

এই ধর্মভাবনায় আত্মতৃপ্তির ভাবটিও মহাভারতকারের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি—

''অদ্রোহঃ সর্বভূতানাং কর্মণা-মনসা-গিরা।

অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্মঃ সনাতনঃ।।''

(মহা. শান্তিপর্ব ১২৬/২৯)

৩০২.২.৫.৪ : ধর্মের বিচিত্র স্বরূপ

আচার্য উপদেশ দিলেন — 'ধর্মং-চর'। কিন্তু সে ধর্ম কোন্ ধর্ম? এ প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে আমাদের প্রবেশ করতে হবে প্রাচীন ভারতীয়-সাহিত্য-শাস্ত্র-দর্শন-পুরাণ-মহাকাব্য প্রভৃতির গভীরে। কারণ ধর্মচর্চা ও চর্যার পীঠস্থান এই ভারতভূমি। ভারতীয় জীবনের সঙ্গে শিকড়ের তন্ময়তা নিয়ে মিশে আছে ধর্ম। বৈদিক কাল থেকে বর্তমান কাল অবধি 'ধর্ম' পদটি বহু বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। কখনো ঘটেছে তার অর্থপ্রসার, কখনো অর্থসংকোচ। ধৃ-ধাতুনিষ্পন্ন 'ধর্ম' শব্দের বাচ্য অর্থ - ধারণ বা ধারণা ('ধারণাৎ ধর্মঃ)। অর্থাৎ যাকে গ্রহণ বা ানুভর করে মানুষ বেঁচে-বর্তে তাকে তাই 'ধর্ম'। বৈদিক যুগে 'ছান্দস্' বা ছন্দোদ্ভব, বেদস্থিত, বেদসম্বন্ধী (ছান্দসীভিঃ ... হরিবংশ ২২৩.৭ প্রভৃতি অর্থে ধর্মশব্দের ব্যবহার সুপ্রচলিত। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে সমৃদ্ধ 'বেদ' যাগ-যজ্ঞাদি-উপাসনা-বিধি ও ঋষিগণের দার্শনিক আত্মোপব্ধিতে পূর্ণ। এই সূত্রে ধর্ম প্রসঙ্গে আচারক্রিয়া ও পারমার্থিক উপলব্ধির ভাব একাত্ম হয়ে গেছে ঐ মহদ্ গ্রন্থে।

যুগ ভেদে বহু অর্থ ও ভাবরূপে ধর্ম শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। অথর্ব বেদে বলা হয়েছে পুরাতনের অনুশীলনই ধর্ম। (ধর্মং পুরাণমনুপালয়ন্তি — অথর্ব ১৮.৩.১) রামায়ণে ধর্ম স্বভাব, ভাব, প্রকৃতি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে - 'মৃত্যুং মরণধর্মেণ যোজয়েয়ম্' (রামায়ণ — Gasparo Gorresis ৩.২৯.১৮) শ্রেয়ঃ, পুণ্য, শুভদৃষ্ট, লোকধারক প্রভৃতি অর্থে ধর্ম শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায় মহাভারতে - 'ধর্মং যো বাধতে ধর্মো ন স ধর্মং কুবত্ম' তৎ।' (মহা ১৩১.১১) যা আমাদের সুপথে চালিত করে তাই ধর্ম, আর এর বিপরীতটাই অধর্ম। মনস্বিনী গান্ধারী 'ধর্ম' বলতে বুঝতেন শ্বাশ্বত ন্যায়নীতির মূর্তপ্রতীক শ্রীকৃষ্ণকে। তাঁর কাছে 'কৃষ্ণ যেখানে ধর্মও সেখানে, যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয়' —'যতঃকৃষ্ণস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ (মহা ১৩.১৬৭.৪১) ধর্মকে পরম মূল্য-বিভূমিষত করে হিতোপদেশে বলা হয়েছে — 'এক এব সহৃদ্ধর্মঃ' —ধর্মই মানুষের একমাত্র সুহৃদ্ (হি.১৬৭ঃ আবার ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুভবে ধর্মের নিহিতার্থ গূঢ় ও রহস্যময় — 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্ ...।' দেশ-জাতি-কুল প্রভৃতি অর্থে 'ধর্ম' শব্দের প্রয়োগ গীতায় সুলভ —

''কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনঃ।

ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোহভিভত্যুত।।'' (গীতা ১৩৯)

'মনুসংহিতা' ধর্ম বলতে বুঝিয়েছেন মানবশাস্ত্রানুশাসন ও তদনুযায়ী বৈধ কর্মগুলিকে। (মনু ১.১১৪.৪১) কালিদাস রঘুবংশে ধর্মকে চতুবর্গের প্রথম বর্গ, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার করেছেন। (রঘু১/২১) গুণবাচক অর্থে ধর্ম শব্দের প্রয়োগ (যেমন ভালবাসার ধর্ম, শোকের ধর্ম প্রভৃতি) প্রাচীন -মধ্য ও আধুনিক যুগের

ভারতীয় সাহিত্যে সুলভ। উপমাসাম্য, অভিধেয়বস্তু প্রভৃতি বোঝাতে ধর্ম শব্দের ব্যবহার করেছেন 'সাহিত্যদর্পণ'-কার-বিশ্বনাথ - ''একোহপি ধর্মঃ সামান্যে যত্র, নির্দিশ্যতে পৃথক্' (সা. দ ১০.৫০) একই ধর্ম হিতোপদেশে 'অহিংসা' (কো ধর্মো ভূতোদয়া)' - হি, ১.১৪৬), কঠোপনিষদে যজ্ঞাদি, ঈশ্বরে অনুরাগ (কঠ ২.১৪), আত্মা (কঠ. ৪.১৪ঃ, মৎস্য পুরাণে ব্রহ্মা দক্ষিণহস্তস্থিত দেবতা-বিশেষ, (ম.পু.৩, ১০) শ্রীমদ্ভাগবতে জীবত্মা, সৎসঙ্গ - ধনুঃ- তপঃ শৌচাদি চারটি পদযুক্ত ধর্মের বৃষরূপ ('ধর্মোহপি বৃষরূপধৃক্' - ভা. ১.১৭.২২ ও ২৮), জ্যোতিষিক গণনায় লগ্ন থেকে নবম স্থান, কাশীরাম দাসের মহাভারতে সোমপ, যম, অর্হদ্‌বিশেষ ও যুধিষ্ঠির (মহা ৫-১); আবার বাংলায় গ্রাম্য-লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুর - 'দআর আসনে ধর্ম বসিল আপনে' (শূন্যপুরাণ - রামাইপণ্ডিত)

৩০২.২.৫.৫ : এসো ধম্মো সনাতনো

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মশাসনে 'ধর্ম' সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা রয়েছে। ভগবান বুদ্ধ ধর্মপ্রসঙ্গে তিনটি স্কন্ধের প্রশংসা করতেন এবং অনুগামী শিষ্যদের সেগুলি পালনের নির্দেশ দিতেন। স্কন্ধ তিনটি যথাক্রমে 'আর্যশীলস্কন্ধ' 'সমাধিস্কন্ধ' ও 'আর্য-প্রজ্ঞাস্কন্ধ' (দীর্ঘনিকায় শুভুসুত্ত - ১০)। শীলসমাধি ও প্রজ্ঞা—বৌদ্ধ ধর্মের মুখ্য তিনটি অঙ্গ। পরবর্তীকালে এদের সঙ্গে আরও দুটি স্কন্ধ যুক্ত হয় — 'বিমুক্তিস্কন্ধ' ও 'বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনস্কন্ধ'। এ সকলের পালনে চিত্ত পরম শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, মার নিহত হয় এবং বোধিলাভ হয়। (দ্র. 'মজ্‌ঝিমনিকায়' — 'মহাসীহনাদসূত্ত' ১২, 'দীর্ঘনিকায়' — 'মহাপরিনিববাণ সূত্ত' ১৬. ও সংযুক্তনিকায়' — 'কোসলনাদসংযুত্ত' ৪,৩,৪) — এই পঞ্চধর্মের সাক্ষাৎ বৌদ্ধমাত্রেরই কর্তব্য সারিপুত্রের সঙ্গে আলোচনায় এমন কথা বলেছিলেন স্বয়ং বুদ্ধ। নির্বাণলিপ্সু নরনারীর কতকগুলি চর্যাচর্য ঐ সকল ধর্ম- স্কন্ধের মূল কথা। বৌদ্ধগণের কাছে 'ধর্ম' তাই নির্বাণের অনুকূলে কতকগুলি আচরণীয় বিধি-নিষেধ। বৌদ্ধ ধর্ম সনাতন আর্যধর্মের একটি শাখামাত্র; গৌতমবুদ্ধের ভাষায় — 'এসো ধম্মো সনাতনো'।

৩০২.২.৫.৬ : রিলিজিয়ন

পাশ্চাত্ত্যে ধর্ম বা পদটি এদেশের মতো বহু অর্থদ্যোতক হয়েও মুখ্যতঃ সাধু-সন্ত মঠ চার্চ ঈশ্বর-বিশ্বাস, ইশোপাসনা-বিধি প্রভৃতি —"Religion-Monastic Condition, being monk or nun, (rare) a monastic order, (rare), practice of sacred rites, on eof the prevalent systems of faith & worship (The Christian, Mohammedan), established, that or established Church, Human recognition of superhuman controlling power & esp, of a persoanal God entitled to obedience, effect of such recognition on conduct & mental attitude" (The Concis Oxforn Dictionary, ed. Flower & Flower, P 988).

৩০২.২.৫.৭ : ইসলাম

ইসলামী ধর্মশাস্ত্র কোরাণ শরীফ'-এও দেখতে পাই, ধর্মপ্রসঙ্গে কতকগুলি পালনীয় আচরণ বিধির উল্লেখ করা বলা হয়েছে - ''তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের ধর্মকে , যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের নিরাপত্তা দান করবেনই। তারা আমার উপাসনা করবে, আমার কোনো অংশী করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই সত্যত্যাগী। যথাযথভাবে নামাজ পড়, যাকাত দাও (দান কর) এবং রসুলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার। তোমরা অবিশ্বাসীদের পৃথিবীতে প্রবল মনে করো না। ওদের আশ্রয়স্থল অগ্নি, কত নিকৃষ্ট এ পরিণাম।'' মওলানা মোবারক করীম জওহর-অনুদিত কোরআন শরীফ (হরফ প্রকাশনী) সুরা নূর ২৪, রকু ৭ (৫৫-৫৬ মন্ত্র) অনুরূপভাবে একই গ্রন্থের ৪১ সংখ্যক সুরা (সূরা হামীম সিজদাহ, রুকু ৫ (৩৩ সংখ্যক মন্ত্র), ৭১ নং সুরা জিন্ রুকু ৪ এবং সুরা কাফেরুন - সুরা ১০৮, রকু ১-৬ প্রসঙ্গতঃ বিবেচ্য।

দেখা গেল, 'ধর্ম' শব্দের বাচ্যার্থ ও অভিধার্থ নিয়ে পণ্ডিতগণের চিন্তা ভাবনার অন্ত নেই এবং এক কথায় এর সমীকরণ প্রায় অসম্ভব। তবুও পৃথিবীর যে - কোনো দেশের তুলনায় ভারতে ধর্মভাবনা-সম্পর্কিত যে বিশেষ ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল, বুধজন তাকে নানাভাবে প্রসারিত অর্থে গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করেছেন। ধর্ম এদেশে যেন কল্পতরুর মতো ব্যক্তির অনুভব বেং সমাজ বা সম্প্রদায়ের অনুভবরূপে বিশ্যেষ মর্যাদার আসনটি অক্ষুন্ন রেখেছে। হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে 'ধর্ম তাই জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি নীতি যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে নিজেদের মধ্যে ও আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে মেনে চলি। এই নীতিগুলি আসলে আমাদের মধ্যে শক্তি ও সাহস সঞ্চারিত করে আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই সূত্রে ধর্ম হল, মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির সেই আনন্দর সময় অভিব্যক্তি — "Truth's embodiment in life and the power to refashion our nature". (The concept of Dharma-Religion and Society - 2nd edn. p. 104 - Dr. S. Radhakrishnan.

বলা বাহুল্য, এরূপ ধর্মভাবনার ক্ষেত্রে পশুর সঙ্গে মানুষের একটা গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান। প্রাকৃতিক বিবর্তনের ধারায় পশু ও মানুষ একই সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে সত্য। কিন্তু প্রবৃত্তিগত মিলটুকু বাদ দিলে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য দুস্তর। দুটি প্রজাতিই মগজ বা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হলেও পশুর নিজ স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও স্মৃতি নেই। অন্যদিকে মানুষ স্বাধীন চিন্তার অধিকারী স্মৃতিশক্তিপরায়ণ বলেই সে মনে রাখে অতীত ও বর্তমানকে এবং ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্মাণ করতে পারে। বৈজ্ঞানিক কোহলার ও অন্যান্যরা দেখিয়েছেন যে শিম্পাঞ্জী ও ওরাংওটাং — এদের সঙ্গে মানুষের একমাত্র পার্থক্যহল যে মানুষ স্মৃতিশক্তিপরায়ণ, আর ওরা স্মৃতিশক্তিহীন। জীববৃত্তে পশু ও মানুষ জন্ম-মৃত্যুরূপ নিয়মের অধীন। কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে পশুর বিবর্তন কেবল তার বংশগতি ও প্রবৃত্তি নির্ভর। তাই বাঘ-সিংহ প্রভৃতি প্রাণীকুলের কোনো সভ্যতা ও সংস্কৃতি নেই, কারণ তাদের কোনো স্মৃতি নেই। অন্যদিকে স্মৃতিশক্তিপরায়ণ, মননশীল মানুষ গড়ে তুলেছে নিজস্ব ইতিহাস-সভ্যতা-সংস্কৃতি। এই মননশীলতা ও স্মৃতি মানুষকে অমরত্বের সন্ধান দিয়েছে, তরুলতা মৃগ-পক্ষী প্রভৃতি থেকে তাকে স্বতন্ত্র করেছে। যোগবাশিষ্ট তাই বলেছেন—

''তরবোহপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।

স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।।''

৩০২.২.৫.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্মের পার্থক্য নির্দেশ করো।

২। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধের অনুসরণে মানুষের ধর্মের স্বরূপ বিশদ আলোচনা করো।

৩০২.২.৫.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। আত্মপরিচয় (বিশ্বভারতী সং) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। মানুষের ধর্ম (বিশ্বভারতী সং) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। *Religion of Man* — Rabindranath Tagore

৪। *Sadhana* — Rabindranath Tagore

৫। *Personality* — Rabindranath Tagore

৬। বাংলার বাউল — ক্ষিতিমোহন সেন

৭। *The Principle Upanishads* — Dr. S. Radhakrishnan

৮। *Indian Philosophy* — Dr. S. Radhakrishnan

৯। *Occasional Speeches and Writings* — Dr. S. Radhakrishnan

১০। *Religion of the Forest* — Rabindranath Tagore

১১। *Religion of the Artist* — Rabindranath Tagore

১২। রবীন্দ্র দর্শন — হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য — কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

১৪। সাহিত্যের বিশ্লেষণ - প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ — কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

পর্যায় গ্রন্থ - ২
একক - ৬
রবীন্ধনাথের মানুষের ধর্ম-এর প্রেক্ষিত

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.২.৬.১ : রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম-এর প্রেক্ষিত

৩০২.২.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০২.২.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০২.২.৬.১ : রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম-এর প্রেক্ষিত

ধর্মের এই সকল বহুধা প্রসারিত বিচিত্র প্রেক্ষণীতে রবীন্দ্রভাবনায় প্রতিফলিত মানুষের ধর্মের স্বরূপ বুঝে নিতে হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মানুষের ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনায় যে সকল কথা বলেছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১৯৩০ সালের মার্চ মাসে বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতামালার সংকলন, **'মানুষের ধর্ম'** (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকরূপে প্রদত্ত 'কমলা'-বক্তৃতা মালার সংকলন) — ১৯৩২-৩৩, **'The Religion of an Artist, the Religion of the Forest,' 'আত্মপরিচয়', 'Sadhana', 'Personality'** প্রভৃতি গ্রন্থ। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে তথাকথিত প্রচলিত কোনো সাম্প্রদায়িক অর্থে গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করেননি। নতুন কোনো ধর্মের প্রবক্তা বা ধর্মনেতাও তিনি নন। অথচ তাঁর বোধ ও মননশীলতায় মানবজীবনে ধর্মের যথাযোগ্য গুরুত্ব স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুবিশাল প্রাচ্য ধর্ম-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার ও পাশ্চাত্ত্য জীবনাভিমুখী বিজ্ঞানচেতনাসমৃদ্ধ মানুষের ধর্মোপলব্ধির কার্যকরী দিকটি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কবির হৃদয়বোধ ও বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের মননের সমন্বয়ে তাঁর ধর্মীয় উপলব্ধি মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ও অগ্রশক্তির বিকাশে সহায়র হয়েছিল। তাঁর **'The Religion of man'** ও **'মানুষের ধর্ম'** গ্রন্থদুটি একে অপরের পরিপূরক। তৎসত্ত্বেও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত **Hibert** বক্তৃতা (১৯৩০) মূলতঃ কবি রবীন্দ্রনাথের আত্মবোধনির্ভর ধর্মপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যান। অন্যদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা-বক্তৃতামালায় প্রদত্ত **'মানুষের ধর্ম'** প্রকৃত প্রস্তাবে কবির ব্যক্তিজীবনের না, সাধারণভাবে সমগ্র মানব-সমাজে মানুষের অনুধ্যেয় ধর্মীয় প্রসঙ্গের শাস্ত্রীয় ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যান।

৩০২.২.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে ধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।

২। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ করো।

৩০২.২.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। আত্মপরিচয় (বিশ্বভারতী সং) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। মানুষের ধর্ম (বিশ্বভারতী সং) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। *Religion of Man* — Rabindranath Tagore

৪। *Sadhana* — Rabindranath Tagore

৫। *Personality* — Rabindranath Tagore

৬। বাংলার বাউল — ক্ষিতিমোহন সেন

৭। *The Principle Upanishads* — Dr. S. Radhakrishnan

৮। *Indian Philosophy* — Dr. S. Radhakrishnan

৯। *Occasional Speeches and Writings* — Dr. S. Radhakrishnan

১০। *Religion of the Forest* — Rabindranath Tagore

১১। *Religion of the Artist* — Rabindranath Tagore

১২। রবীন্দ্র দর্শন — হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য — কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

১৪। সাহিত্যের বিশ্লেষণ - প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ — কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

পর্যায় গ্রন্থ - ২
একক - ৭
মানুষের ধর্মকেন্দ্রিক রাবীন্দ্রিক বোধ

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.২.৭.১ : মানুষের ধর্মকেন্দ্রিক রাবীন্দ্রিক বোধ

৩০২.২.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০২.২.৭.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০২.২.৭.১ : মানুষের ধর্মকেন্দ্রিক রাবীন্দ্রিক বোধ

নিজের ধর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বললেন — "My Religion is the reconciliation of the super personal Man, theUniversal Human Spirit in my own individual being." (The Religion of Man) অর্থাৎ জীবশরীরে অতীন্দ্রিয়-নৈর্ব্যক্তিক পরাশক্তির তথা চিরন্তন মানবশক্তির উপলব্ধিকে তিনি তাঁর ধর্ম বলতে চেয়েছেন। নিজেকে তিনি কবিরূপে - 'বিশ্বরচনার অমৃতস্বাদের যাচনদার' রূপে বারংবার তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন — "I have already confessed that my religion is a poet's religion, all that I feel about it is from vision and not from knowledge." (The religion of an Artist, P-12) ''আত্মপরিচয়'-এ আরও পরিষ্কারভাবে নিজের ধর্মবোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বললেন — ''ঠিক যাকে সাধারণে ধর্ম বলে সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারিনে। কিন্তু মনের ভিতরে ক্রমশঃ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠেছে, তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো একটা নির্দিষ্ট মত নয়- একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নতুন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশঃ আপনার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব- আমার সুখ-দুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আচরণ সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব।'' ('আত্মপরিচয়'- ১ম অধ্যায় পৃ.-১৫)। ধর্মের মধ্যে জীবনের সামঞ্জস্য বিদান তথা সমগ্রতা-উপলব্ধির ভাবটি এখানে সুপরিস্ফুট হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ 'ধর্ম' বলতে বুঝতেন বিশ্বহিতে নিরত মনুষ্যত্ববোধের সমুজ্জ্বল আদর্শকে। ধর্মের প্রকৃত উপলব্ধি ঘটে মনুষ্যত্ব বিকাশের সাধনায়। আত্মকেন্দ্রিকতা নয়, সংকীর্ণ স্বার্থবোধ নয়, — বৃহৎ ও মহৎ জীবনের সাধনার অন্য নাম ধর্ম। তাঁর নিজের ভাষায় — ''স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা

দেখি জীবপ্রকৃতিতে। যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।'' (মানুষের ধর্ম — ভূমিকা)

মানুষের পূর্ণতা দেহে -মনে ভাবে। দেহগতভাবে মানুষের দটো সত্তা—

(১) জীবসত্তা - ছোট, খণ্ডিত আমি বা 'অহং' এবং (২) মানবসত্তা - বড়ো অখণ্ড আমি বা ''আত্মা''। মানষের সাধনা — জীবাত্মা থেকে মানবাত্মায় উত্তরণের সাধনা। বিশ্বের সকল মানবের অন্তরে আছেন এমন এক সত্তা যা ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত, তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' এই শাশ্বত মানুষটির প্রেরণাতেই মানুষের চিন্তায় কর্মে ভাবে বিশ্বজনীনতার আবির্ভাব। আপন অন্তরস্থিত এই বড়ো মানুষটির উপলব্ধিতে ব্যক্তি তার জীবসীমা অতিক্রমে করে মানব সীমায় উত্তীর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ''এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।'' এই অন্তরের মানবকেই মানুষ নাম দিয়েছে দেবতা, বলেছে — 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। এই মানবদেবতার প্রেরণাতে মানুষ অনুভর করেছে - ''সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। সেই বিরাট মানব 'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।'' মানুষের জীবকোষের মধ্যেই রয়েছে এই বিশ্বদৈহিক প্রবণতা। সে একই সঙ্গে স্বদৈহিক হয়েও বিশ্বদৈহিক।

মনোধর্মেও মানুষ দুইপ্রকার মনের অধিকারী (১) ব্যক্তিমন ও (২) বিশ্বমন। আবার ভাবধর্মের দিক থেকেও মানুষ দুটি ভাবের অধিকারী। (১) ব্যক্তিভাব ও (২) বিশ্বভাব। মনোগত ও ভাবগত দিক থেকেও মানবজীবনের লক্ষ্য ব্যক্তিমন থেকে বিশ্বমনে এবং ব্যক্তিবাব থেকে বিশ্বভাবে উত্তরণ। অতএব মানুষের ধর্ম, মানুষের সাধনা — এই সত্যোপলব্ধির সাধনা; কারণ'' যে মানুষ আপন আত্মর মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে, সেই জানে সত্যকে - যন্মিস্মন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্বভূতেষু চাত্মানং ততে ন বিজগুপ্সতে।।' নরের মধ্যে নারায়ণের, দেহভাণ্ডে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের - বিশ্বদেবতার অস্তিত্বের অনুভব আসলে মনুষ্যত্বেরই অনুভব। নিজের হৃদয়ের অন্তপুরে 'মনের মানুষের' অন্বেষণ, সেই বিশ্বদেবতা — বিশ্বকর্মা মহাত্মার উপলব্ধিই রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্মের মূল উদ্দেশ্য। তাই বিশ্বের শুভবুদ্ধি পরায়ণ সকল মানুষের প্রার্থনা — 'স দেবঃ/স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু' — সেই দেবতা আমাদের শুভবুদ্ধি দান করুন।

'মানুষের ধর্ম' বিষয়টিকে সপ্রসঙ্গ ও পূর্ণায়ত রূপদানের জন্য রবীন্দ্রনাথ সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত নৃতাত্ত্বিক ও দার্শনিক যুক্তিপ্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির সারনির্যাস গ্রহণ করলে বক্তব্যে বিষয়টি দাঁড়ায় এইরূপ :

সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে মানুষের আবির্ভাব। দেহে ও মনে তার পূর্ণতা। দেহভেদে সে অন্য থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু মনোধর্ম অন্যের সঙ্গে তার মিল। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়। বহুর মধ্যে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করে জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে সকলের যুক হওয়াতে সে চরিতার্থতা লাভ করে। এই ব্যক্তি যতই নিজেকে বিশ্বমনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে, ততই সে সত্য

হয়ে ওঠে। ব্যক্তিমনের সঙ্গে বিশ্বমনের এই যোগেই মানুষের সভ্যতা। এই সর্বজনীন, সর্বকালীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। এই বৃহৎ মানুষের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — ''এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরের আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।'' বৃহৎ মানুষে সাধনাই সত্যের সাধনা; বাহ্যানুষ্ঠানে নয়, আত্মানুভাবে। উপনিষদ্ তাই বলেন 'যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে, সেই জানে সত্যকে —

''যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যোবানুপশ্যতি।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে''।

প্রতিটি ব্যক্তি মানবের দুটো ভাব — জীবভাব ও বিশ্বভাব। বিশ্বভাব হল জীবভাবের সংকীর্ণতামুক্ত এমন একটা আদর্শ যা ব্যক্তি মানুষের সীমানা ছাড়িয়ে পূর্ণতার দিকে, বিশ্বমানবতার দিকে এগিয়ে চলে।

শারীরবৃত্তে মানবদেহে আপাতন স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও বহুকোটি কোষের সমন্বয়। এই সমন্বয়েই সমস্ত দেহের জীবনের সার্থকতা। আবার কোষময় সত্তার অভিব্যক্তিও স্বদৈহিক নয়, বিশ্বদৈহিক যা সমস্ত দেহের জীবন-প্রবাহে পরিব্যাপ্ত। জীবকোষগুলিও অপন ক্ষুদ্রভাবে স্বতন্ত্র, বৃহৎভাবে সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত। এ ছাড়াও আরও একটা প্রত্যক্ষাতীত পদার্থ রয়েছে যা সর্বদেহব্যাপী কল্যাণ, যাকে বলি স্বাস্থ্য। জীবকোষগুলি যে ধর্ম আশ্রয় করে স্বতন্ত্র কোষধর্ম রক্ষা করেও দেহের কল্যাণ তথা স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেষ্ট — সেই ধর্মের আশ্রয় তাদের বিশ্বদেহ। মানুষের জীবকোষের মধ্যেও প্রকৃতিগতভাবে এই বিশ্বদৈহিক প্রবণতা। এই সূত্রে মানুষ 'আপন অন্তরের গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করে অনুভব করেছে যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। সেই বিরাট মানব 'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।' পাখির ছানা যে পর্যন্ত ডিমের ভিতরে থাকে, তার অপরিণত অঙ্গে সুচনা হয় ডানার। ডিমের বাঁধা জীবনে সেই ডানার কোনো অর্থেই নেহি। কিন্তু সেই অপুষ্ট ডানার সংকেত জানিয়ে দেয় ''ডিমের বাইরে সত্যের যে পূর্ণতা আজও তার কাছে অপ্রত্যক্ষ, সেই মুক্ত সত্যে সঞ্চরণেই পাখির সার্থকতা। তেমনি মানুষের পূণসত্যের পরিচয় ফুটে ওঠে তার চিত্তবৃত্তির ঔৎসুক্য। এই উদ্যম-উৎসাহে মানুষও যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমুক্ত, সেখানে সে বিশ্বাভিমুখী।

মানুষ কোনো যন্ত্র নয়, কারণ যন্ত্রের কোনো স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নেই, গতিও নেই। মানুষ সীমাবদ্ধ জীবও নয়, সেই কারণে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াতেই তার আনন্দ। মনের আশ্রয়ে সে আপন সীমা অতিক্রম করে অসমীনে সন্ধানী। দেহগত বিচারেও মানুষ জন্তু থেকে পৃথক এবং উন্নত। তার দেহটা 'চতুষ্পদ জীবের প্রশস্ত ছন্দে' বানানো হলেও সমস্ত জান্তব প্রকৃতি ও বাধা বিপত্তি কাটিয়ে সে স্পর্ধাভরে উঠে দাঁড়িয়েছে।

নিম্নদৃষ্টি জন্তু খণ্ড খণ্ড বস্তুকে দেখে ঘ্রাণযোগে, 'দেহবৃত্তির সংকীর্ণ সীমায়।' তার দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তি আশু প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিন্তু উন্নতমস্তক মানুষ দেখল কেবল বস্তুকে নয়, দৃশ্যকে অথবা বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে। ''একটি অখণ্ড বিস্তারের কেন্দ্রস্থলে দেখলে নিজেকে। একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি।'' মানুষ উন্নত (খাড়া-

হাওয়া) জীব বলেই তার বহির্দৃষ্টি ও অন্তরের কল্পনাদৃষ্টি নিকট অপেক্ষা দূরের প্রতি, অজ্ঞাত অভাবনীয়ের প্রতি বেশি আকর্ষণ বোধ করেছে। এর সঙ্গে দ্বিপদ মানুষের হাত দুটোও পায়ের কাজ থেকে ছুটি পেয়ে মুক্ত হয়েছে দাসত্বের বন্ধন থেকে। এর প্রমাণ আছে পুরাণে। পুরাণে বলে, ব্রহ্মার পায়ের থেকে শুদ্র জন্মেছে, ক্ষত্রিয়-হাতের থেকে।

এমনিভাবে মানুষের দেহে পদোন্নতি হল ক্ষাত্রধর্মে অর্থাৎ হাতের গৌরবে। এই হাতের সঙ্গে যুক্ত হল মানুষের মন ওকল্পনাশক্তি। কর্মেন্দ্রিয় ও মননেন্দ্রিয়ের সহযোগে সে আর জৈবিক প্রয়োজনেই নিজেকে আবদ্ধ রাখল না, কেবল অন্ন-ব্রহ্মের উপাসনা করল না, বেরিয়ে পড়ল, বিজ্ঞানময় আনন্দময় ব্রহ্মের সন্ধানে। কোনো প্রয়োজনের তাগিদে নয়, নিজের খুশিতেই সে তার অন্নময় কোষের আবরণ ভেদ করে পশুত্ব থেকে মুক্তি চেয়েছে। মানুষের এই কাজটাকে বলা যেতে পারে তার লীলা। অর্থাৎ যেখানে সে দেহধারণের জন্য অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের প্রয়োজন ছাড়িয়ে আনন্দরসের সন্ধানী, ব্যক্তিপ্রয়োজনের গণ্ডী পেরিয়ে অসীমের অভিমুখী, সেখানে সে সত্যকে পায়, আনন্দকে পায়। সত্যের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে যোগের প্রসারেই আত্মার সত্য।

মানুষ যে আত্মকামনায় দীপ্ত তা জৈবিকতার জন্য নয়, অন্যের সঙ্গে নিজের একাত্মতা স্থাপনের প্রেরণায়। পুত্র চাই বলেই পুত্র প্রিয় হয় না, তার মধ্যে নিজেকেই খুঁজে পাই ব'লে সে আমার প্রিয়—

''ন আর অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।

আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।''

মানুষ কি করে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবে তা নিয়ে বর্বর দশা থেকে সভ্য দশা পর্যন্ত তার চিন্তার অন্ত নেই। ''আমি কে, আম কী, আমার চরম মূল্য কোথায়'' — প্রভৃতি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে সে আত্মস্বরূপ অন্বেষণে তৎপর। নানা তন্ত্রে-মন্ত্রে দেবার্চনায় তার এই চেষ্টা। কিন্তু যেখানে সে শ্রেয়োবোধে দীপ্ত বৃহৎ আদর্শের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে ব্যাপৃত, সেখানেই সে সত্য। কারণ ''মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস।'' এখানেই সে জন্তুর ভৌমণ্ডলিক সীমা অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হয়েছে মানসিক দেশ চেতনায়। জ্ঞানে- কর্মে -তপস্যায় আত্মত্যাগে এই দৈশিক চেতনায় সে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল খুঁজে পেয়েছে, মৈত্রী স্থাপন করেছে। খণ্ড দেশ-কাল-পাত্র ছাড়িয়ে, জাতি-ধর্ম-কর্মের ভেদবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে মানুষের জয়যাত্রা এগিয়ে চলেছে সেই দিকে যেখানে মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের মানুষকে নিয়ে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - কোনো কালেই এই জয়যাত্রার রথ থেমে থামেনি। মানুষের এই অধ্যবসায়কে বলা যেতে পারে তার মহত্ব। এই মহত্ত্বের আশ্রয় পূর্ণতায়। মানুষের ধর্ম, মানুষের সাধনা, অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায়, সীমাবদ্ধতা থেকে অসীমে মুক্তির সাধনা।

সীমাকে মানুষ কোনো দিনই স্বীকার করছে না কারণ তাহলে সীমার মধ্যে তার জিজ্ঞাসা অসমাপ্ত থেকে যেতো, সভ্যতার অগ্রগতির হ'তো রুদ্ধ।সীমাকে অতিক্রমের তাগিদে মানুষ একদিকে যেমন ভৌত বিজ্ঞানের আশ্রয়

নিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আশ্রয় নিয়েছে বোধির। অর্থাৎ প্রত্যক্ষকে স্বীকার করেও অপ্রত্যক্ষের অন্তহীন রসলোকের প্রতিই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। এখানেই সে সত্যকে পায়, ভূমা বা আনন্দকে পায়। এইভাবে মানুষ নিয়ত প্রজ্ঞার সাধনা করছে, বস্তুসত্যের তথ্যের স্তূপ অপসারিত করে প্রবহমানতার তাগিদে সত্যের স্বাদ আহরণ করছে, এখানেই জন্তুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য - ''অন্যান্য জন্তুর মতই তথ্য মানুষের সম্বল, কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য। তার চরম লক্ষ্য অভাব দূর করা নয়, মহিমাল উপলব্ধি করানো। তাই ঐশ্বর্য-অভিমানী মানুষ বলেছে 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' বলেছে অল্পে সুখ নেই, বৃহতেই সুখ।''....

মানুষের সত্তার মধ্যে দ্বৈধতা আছে। তার যে সত্তা জীবসীমার মধ্যে, সেখানে যেটুকু আবশ্যক সেটুকুতেই তার সুখ। কিন্তু অন্তরে অন্তরে জীব-মানব বিশ্বমানবেই প্রসারিত; সেদিকে সে সুখ চায় না সুখের বেশি চায় — সে ভূমাকে চায়'' উপনিষদের কথা, ভগবান নিজের স্বভাবে, নিজের মহিমায় (স্বে মহিম্নি) প্রতিষ্ঠিত। সেই মহিমাই তার স্বভাব। সেই স্বভাবেই তিনি আনন্দিত। তেমনি মানুষের মহিমাও ঐ আনন্দে। তাই বলা হয়েছে 'ভূমৈব সুখম্'। মানুষের স্বভাবের মধ্যে রয়েছে বিরোধ। তাই বিরোধের মধ্য দিয়েই সে আনন্দকে পেতে চায় বাঁধা বরাদ্দের সীমা ছাড়িয়ে। এটা তার উপরি পাওনা, এতেই প্রকাশ পায় তার মহিমা।

মানুষ নিয়ত মনুষ্যত্ব বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করে চলেছে বলেই পশুধর্মের সঙ্গে মানবধর্মের, বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের দ্বন্দ্ব বেধেছে। পশুধর্মের সহজ ভোগের পথ ত্যাগ করে মানুষ ব্রতী হয়েছে মানবধর্মের তপস্যায় — মৃত্যু থেকে অমৃতে, ব্যক্তিগত সীমা থেকে বিশ্বগত বিরাটে, প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষে। মানুষের বুদ্ধি তাকে জ্ঞানের পথে আকৃষ্ট করে। এই জ্ঞানে সে জেনেছে প্রত্যক্ষ বাস্তবকে। কিন্তু সেখানেই তার জিজ্ঞাসা থেকে থাকে নি, তার প্রসারিত হয়েছে গূঢ় আত্মজিজ্ঞাসায়, মানবধর্মের গভীরে নিহিত সত্যে। সকল খণ্ডিত জানাকে অতিক্রম করে মানুষ চেয়েছে শোত্রের শোত্র, মনের মন, প্রাণের প্রাণ সেই এক অদ্বিতীয় সত্যকে যার অস্তিত্ব মানুষের অন্তরতম বোধে। সেই বোধের সাধনাকে মানুষ বলে ধর্মসাধনা।

'ধর্ম' শব্দের আর এক অর্থ স্বভাব। তাই স্বভাবকে স্বীকার করেই মানুষের ধর্মসাধনা। কিন্তু নিজের সহজ স্বভাবকে সে স্বীকৃতি দেয় না, শ্রদ্ধা করে না। স্বভাবেরও দুটে দিক - একটা আত্মগত, অন্যটা ভূমাগত। এই দ্বিতীয় স্বভাবটাই তার কাছে অধিকতর সত্য। এই জন্য শাস্ত্রে বলে—

''শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য, বিবিনক্তি ধীরঃ।

তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু হীয়তোহর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে।।

অর্থাৎ ''মানুষের স্বভাবে শ্রেয়ও আছে, প্রেয়ও আছে। ধীর ব্যক্তি দুইকে পৃথক করেন। যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি সাধু, যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি পুরুষার্থ থেকে হীন হন।''

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃকে নিয়েই মানবস্বভাবের পূর্ণতা। প্রেয়োবোধ মানুষের প্রবৃত্তিজাত। একে গ্রহণ করেও সে তার সঙ্গে শ্রেয়ঃকে যুক্ত করে। এইভাবে প্রাকৃতিক স্বভাবে উপরেও নিজের আত্মিক স্বভাবকে মর্যাদা দিয়ে

সে নিজের মধ্যেই সর্বকালীন বিশ্বভূমিন মনুষ্যধর্মকে উপলব্ধি করেছে। তার এই প্রচেষ্টা, জ্ঞানের এই সাধনা, ব্যক্তিগত সংস্কার কাটিয়ে বিশ্বগত কর্মের দ্বার উদ্বুদ্ধ হবে তার প্রেম, সে হয়ে উঠবে বিশ্বকর্মা বিশ্বগত আত্মীয়তার সে হবে মহাত্মা। 'মানুষের এই সত্য স্বভাবেই তার যথার্থ মুক্তি। কারণ মানুষের একটা স্বভাবে আবরণ অন্য স্বভাবে মুক্তি।'

বেদে ঈশ্বরকে বলা হয়েছে আবিঃ-প্রকাশস্বরূপ। তিনি আবার 'মহাদ্‌যশঃ' ও - আপন মহৎ কীর্ত্তিতেই তিনি সত্য। মানুষের স্বভাবও তাই - আত্মাকে প্রকাশ। দৈহিক ও অর্থনৈতিক ঐশ্বর্যের দিক থেকে মানুষের যে প্রকাশ তা অহংমন্য হীনতাই প্রকাশ। সেখানে প্রাণীজগতের পশুদের সঙ্গে তার মিল কিন্তু যেখানে সে তার সত্যকে, ভূমানন্দকে প্রকাশ করে, সেখানে সে পশু থেকে পৃথক। যা কিছু বস্তুগত বা বাহ্যিক তা সীমায় আবদ্ধ। কেননা তাকে বাড়িয়ে চলা সম্ভব হলেও পেরিয়ে চলা যায় না। মানুষ সব সময় এই সীমাকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্ট করেছে। ''অন্যের চেয়ে আমার বস্তুসঞ্চয় বেশি, এ কথা মানুষের পক্ষে বলবার কথা নয়। তাই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিহমহং তেন কুর্যাম্। তিনি উপেক্ষা করেছিলেন উপকরণবতাং জীবিতম্।''

যথার্থ গায়কের গান তখন বিস্তারে সংখ্যা দ্বারা সার্থক হয় ন্য সার্থক হয় মসগ্রতা দ্বারা। শ্রেষ্ঠ গায়কের সফল গান তাই 'অপরিমেয়, অনির্বচনীয়, যেখানে সুর-তাল-লয়ের সুষম সামঞ্জস্য আত্মপ্রকাশের অসীম আনন্দে আত্মহারা। মানুষ তাই প্রতিমুহূর্তে তার অহং-এর খণ্ডিত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র থেকে অসীমের দিকে, আত্মার দিকে এগিয়ে চলেছে। সৌন্দর্যে-কল্যাণে-বীর্যে ত্যাগে প্রাকৃত মানুষকে অতিক্রম করে আসল মানুষ প্রকাশ করে আপন আত্মাকে। উপলব্ধি করে জীবমানবের অন্তরতম বিশ্বমানবকে। এর চেয়ে বড়ো লাভ আর কিছুতেই নেই- ''যং লব্ধা চাপরং লাভং নাধিকং মন্যতে ততঃ।''

৩০২.২.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ধর্ম নিয়ে রাবীন্দ্রিক বোধের স্বরূপ বিবেচনা করো।

২। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধের প্রেক্ষিতে ধর্মের সত্যস্বরূপ বিশ্লেষণ করো।

৩০২.২.৭.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। আত্মপরিচয় (বিশ্বভারতী সং) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। মানুষের ধর্ম (বিশ্বভারতী সং) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। *Religion of Man* — Rabindranath Tagore

৪। *Sadhana* — Rabindranath Tagore

৫। *Personality* — Rabindranath Tagore

৬। বাংলার বাউল — ক্ষিতিমোহন সেন

৭। *The Principle Upanishads* — Dr. S. Radhakrishnan

৮। *Indian Philosophy* — Dr. S. Radhakrishnan

৯। *Occasional Speeches and Writings* — Dr. S. Radhakrishnan

১০। *Religion of the Forest* — Rabindranath Tagore

১১। *Religion of the Artist* — Rabindranath Tagore

১২। রবীন্দ্র দর্শন — হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য — কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

১৪। সাহিত্যের বিশ্লেষণ - প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ — কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

পর্যায় গ্রন্থ - ২
একক - ৮
মানবধর্ম

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.২.৮.১ : মানব ধর্ম সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা

৩০২.২.৮.২ : মানুষের ধর্মের পরম উপলব্ধি : বাউলের অন্বেষা

৩০২.১.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০২.২.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০২.২.৮.১ : মানব ধর্ম সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা

'মানুষের ধর্ম' - এর দ্বিতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'মানবধর্ম' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অথর্ববেদে আছে—

ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমোধর্মশ্চ কর্মচ

ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষ্মীবলং বলে।

অর্থাৎ ঋত, সত্য, তপস্যা, রাষ্ট্র, শ্রম, ধর্ম, ভূত, ভবিষ্যৎ, বীর্য, সম্পদ ও বল - সমস্তই উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ উদ্বৃত্ত বলে গণ্য। ঐ সব গুণগুলির সবই মানবগুণ যেগুলি প্রকৃতির প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে না বলেই উদ্বৃত্ত। তাই 'জীবজগতে মানুষ বাড়তির ভাগ। প্রকৃতির বেড়ার মধ্যে তাকে কুলোলো না।' ঐ সকল মানবগুণের যোগে আমার অনুভব করি জীবসীমার অতিরিক্ত সত্তাকে - মানবব্রহ্মকে। আমাদের সত্যবোধে, তপস্যায় ধর্মে-কর্মে সেই মানবকে — মানবব্রহ্মকেই অনুভব করি। এই মানবব্রহ্মই আমাদের জীবনের পরমলক্ষ্য - পরম গতি, পরম সম্পদ, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ। উপনিষদ্ তাই বলেছেন —

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদ্

এষোহস্য পরমো লোক এষোস্য পরম আনন্দং।''

এই বোধ যখন জাগে তখন মন সেই বৃহৎ - অসীম সত্যকে অনুভব করে, ভক্তি করে। তখন মনে হয়, 'এক বৃহৎ আনন্দের অন্তর্গত আমার আনন্দ।'

জড় জগতে এক একটি বস্তু যেমন তার সম্বন্ধশক্তি, ঐক্যশক্তির প্রতীকরূপ, তেমনি প্রাণীজগতে দেশ-কালের ব্যবধান সত্ত্বেও সমস্ত মানুষকে নিয়ে আছে একটি 'বৃহৎ' এবং গভীর 'ঐক্য'। সেই ঐক্য ইন্দ্রিয়বোধের অতিরিক্ত সংখ্যা-সমষ্টিকে নিয়ে নয়, তাকে অতিক্রম করে। সেই ঐক্য সমস্ত মানুষের এক গূঢ় আত্মা, তার প্রকাশ বহুধা শক্তিযোগে। সকল মানুষের মধ্যে সেই ঐক্যশক্তি বর্তমান। সেই শক্তিকে, জীবনমানবরূপী আত্মাকে যিনি নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারেন তিনি মহাত্মা। তাঁরা সর্বমানবের জন্য নিজের প্রাণ দিতে পারেন, ''গূঢ় আত্মার

প্রতি লক্ষ্য করে বলতে পারেন; তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাদ্ অন্তরতরং যদয়মাত্মা। তিনি পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, অন্য সকল হতে প্রিয়, এই আত্মা যিনি অন্তরতর।''

মানুষ সকল বিষয়বস্তুর মধ্যে মানবত্বকেই অনুভব করে। দেবতাকেও প্রিয় বললে তার উপর মানবত্ব আরোপ করা বোঝায় না। এর অর্থ মানবত্ব উপলব্ধি করা। ''মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করে আপন দেবতায় এসে পৌঁছেছে। মানুষের মন আপন দেবতায় আপন মানবত্বের প্রতিবাদ করতে পারে না। করা তার পক্ষে সত্যই নয়। ঈথরের কম্পনে মানুষ আলোকত্ব আরোপ করে না, তাকে স্বততই আলোকরূপে অনুভব করে, আলোক রূপেই ব্যবহার করে, করে ফল পায় — এও তেমনি।''

কিন্তু পরম মানবিক সত্তাকে অতিক্রম করেও আছে পরম জাগতিক সত্তা। যেমন সূর্যালোক অতিক্রমী নক্ষত্রলোক। এই সূর্যালোককে কেন্দ্র করেই পার্থিব জীবন, দিন-রাত্রি, চলা-ফেরা সবই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''জ্ঞানে আমরা নক্ষত্রলোককে জানি কিন্তু জ্ঞানে কর্মে আনন্দে দেহমনে সর্বতোভাবে জানি এই সূর্যালোককে। তেমনি জাগতিক ভূমা আমাদের সমগ্র দেহমন ও চরিত্রের পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার বিষয়। আমাদের ধর্মশ্চ কর্মচ, আমাদের ঋতং সত্যং, আমাদের ভূতং ভবিষ্যৎ সেই সত্তারই অপর্যাপ্তিতে।''

মানবিক সত্তা পেরিয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তা তাকে প্রিয়, মন্দ প্রভৃতি গুণ-দোষবাচক অভিধা দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলবে না। কারণ যা নৈর্ব্যাক্তিক তাকে নিয়ে ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, পাপ-পুণও প্রভৃতির বিচার চলে না। কেন না তা ঐসকল স্বভাববর্জিত। ঋষিকবি তাই বলেন, 'অস্তীতি ধ্রবতোন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে? তিনি আছেন এ ছাড়া তাঁকে কিছুই বলা যায় না। বস্তুত বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় আমার যে জগৎকে জানি সে জগৎ মানব জগৎ। এই জগতের গূঢ় তত্ত্বকে মানুষ যেভাবে আপন অন্তর্নিহিত তত্ত্বের দ্বারা মিলিয়ে পাচ্ছে তাকে অতিমানবিক' বলা চলে না। আমাদের শাস্ত্রে যে সগুণ ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে তিনি 'সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্। ''তার অর্থ এই যে, মানবব্রহ্ম, তাই তাঁর জগৎ মানবজগৎ। এ ছাড়া অন্য জগৎ যদি থাকে তাহলে সে আমাদের সম্বন্ধে শুধু যে আজই নেই তা নয়, কোনো কালেই নেই।'' যে বোধে আমরা জগৎকে জানি, সেই একই বোধে জানি নিজেকে, নিজের আত্মাকে। এই আত্মা স্বপ্রকাশ। কিন্তু সর্বমানবাত্মার মিলিত ঐক্যরূপ। তিনি পরমাত্মা। ''এই পরমাত্মা, ইনি সদা জানানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ইনি আছেন সর্বদা জনে-জনের হৃদয়।''

ভৌত জগতের সঙ্গে আমাদের বাস্তব পরিচয় ইন্দ্রিয়ের বোধে। কিন্তু আত্মিক জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় প্রেমে। এক আত্মার সঙ্গে আর এক আত্মার 'যে সম্বন্ধ সকলের চেয়ে, নিবিড়, সকলের চেয়ে সত্য, তাকেই বলে প্রেম।'' অপরিমেয় রহস্য, অনির্বচনীয়ের স্পর্শ এই প্রেমে। প্রশ্ন ওঠে, পিতামাতার সহ্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তরটা সহজ নয়। সাধারণভাবে বলা যায় মাটিতে। কিন্তু সত্য হল, যিনি 'পিতৃতমঃ পিতৃণাম্ - সকল পিতাই যার মধ্যে পিতৃতম হয়ে আছেন তাঁরই মধ্যে।' আপন আত্মার গভীরে পিতামাতার রহস্য বুঝতে পারি, বুঝতে পারি পিতৃতমকেও। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ''সেই পিতৃতম বিশেষ কোনো স্বর্গে নেই, নিশেষ কোনো দেশকালে বদ্ধ ইতিহাসে নেই, ইনি বিশেষে কোনো একটি মানুষে একদা অবতীর্ণ নন, ইনি প্রেমের সম্বন্ধে মানবের ভূতভবিষ্যৎকে পূর্ণ করে আছেন নিখিল মানবলোকে। আহ্বান করেছেন দুর্গম পথের ভিতর দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে, অসত্যের থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে,

দুঃখের মধ্য দিয়ে, তপস্যার মধ্য দিয়ে।'' এই আহ্বান মানুষকে কোনোকালে কোথাও থামতে দিলে না; তাকে চিরপথিক করে রেখে দিলে।' এই আহ্বান স্যতরে আহ্বান যার আকর্ষণে মানুষ প্রতিবাদে আপনাকে ছাড়িয়ে যায়। অর্থববেদে বলা হয়েছে, 'এই আরোর দিকে, এই ছাড়িয়ে যাবার দিকে মানুষের শ্রী, তার ঐশ্বর্য, তার মহত্ত্ব।' তাই মানবদেবতার কথা প্রসঙ্গে ঋষি বলেন —

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা

তত্তদেবাবগচ্ছ তং মম তেজোহংশসম্ভবম্।

অর্থাৎ 'যা কিছুতে ঐশ্বর্য আছে, শ্রী আছে, শ্রেষ্ঠতা আছে, সে আমারই তেজের অংশ থেকে সম্ভূত।'

বিশ্বমানবমনের প্রকাশ প্রকাশ বিশুদ্ধ সত্যের উপলব্ধিতে। শিল্পই হোক আর সৌন্দর্যই হোক তাকে অন্তরের ভালোলাগা, ভালোবাসা দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। জীবনধারণের জন্য এর প্রয়োজন নেই, এর প্রয়োজন আত্মিক। অর্থাৎ মহৎ কোনো কিছুর উপলব্ধি তাকে বাইরের দিকে থেকে পাওয়া নয়, অন্তরের দিক থেকে পাওয়া।

মানুষ নিয়ত হয়ে উঠছে। এই হয়ে ওঠার সঙ্গে প্রাপ্তিরও একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু 'যা চরম পাবার বিষয় তার সঙ্গে মানুষ একাত্মক, মানুষ তারই মধ্যে সত্য - কেবল তার বোধের বাধা আছে।' এই পাওয়া কেবল জ্ঞানে পাওয়া নয়, হওয়ার দ্বারা পাওয়া — 'দুশ্চরিত থেকে বিরত হওয়া, সমাহিত হওয়া, রিপুদমন করে অচঞ্চলমন হওয়া দ্বারাই তাঁকে পেতে হবে। অর্থাৎ এ এমন পাওয়া যা আপনারই চিরন্তন সত্যকে পাওয়া'

মানুষ বিশ্বাস করে যে প্রত্যক্ষ বিচ্ছিন্নতাকে পরিপূর্ণ করে আছে 'অপ্রত্যক্ষ নিখিলতার সত্য'। তার মনে আছে অপ্রত্যক্ষ নিখিলকে সমগ্র করে উপলব্ধির প্রেরণা। এই হল তার ভূমার বোধ।— ''মানুষ অন্তরে বাহিরে অনুভব করে — সে আছে একটি নিখিলের মধ্যে। সেই নিখিলের সঙ্গে সচেতন সচেষ্ট যোগসাধনের দ্বারাই সে অপনাকে সত্য করে জানতে থাকে। বাহিরের যোগে তার সমৃদ্ধি, ভিতরের যোগে তার সার্থকতা।''

আপন সত্তার পরিচয়ে মানুষের দুটি ভাগ - একটি তার অহং, অন্যটি তার আত্মা। অহংকে যদি প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহেল সেই প্রদীপনির্গত আলো হল তার আত্মা। বস্তুত মানুষের আলো দ্বালায় তার আত্মা তখন তার অহংকার ছোটো হয়ে যায়। তখন ব্যাপ্তির মধ্যে জ্ঞানে প্রেম ভাবে সার্থক হয় সেই আত্মা। এই আত্মার সত্যতা ধরা পড়ে পরম মানবত্মার বন্ধনে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন, ''...আত্মার সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন, 'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্' — সেই আত্মাকে জানো, সেই এককে, যাকে সকল আত্মার মধ্যে এক করে জানলে সত্যকে জানা হয়। প্রার্থনা মন্ত্রে আছে, য একঃ যিনি এক, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, শুভবুদ্ধির দ্বারা তিনি আমাদের সকলকে এক করে দিন। যে বুদ্ধিতে আমরা সকলে মিল, সেই বুদ্ধিই শুভবুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই আত্মার। যথেবাত্মা পরস্তদ্বদ্ দ্রষ্টব্যৎ শুভমিচ্ছতা। আপনার মতো করে পরকে দেখার ইচ্ছাকেই বলে শুভ ইচ্ছা, সিদ্ধিলাভেও শুভ নয়, পুণ্য লোভেও শুভ নয়। পরের মধ্যে আপন চৈতন্যের প্রসারণেই শুভ, কেননা পরম মানবত্মার মধ্যেই আত্মা সত্য।

সর্বব্যাপী স ভগবান্ সর্বগতঃ শিবঃ। যেহেতু ভগবান সর্বগত, সকলকে নিয়ে আছেন, সেই জন্যই তিনি শিব। সমগ্রের মধ্যেই শিব, শিব ঐক্যবন্ধনে। আচারীরা সামাজিক কৃত্রিম বিধির দ্বারা তখন খণ্ডতার সৃষ্টি করে

তখন কল্যাণকে হারায়, তার পরিবর্তে যে কাল্পনিক পদার্থ দিয়ে আপনাকে ভোলায় তার নাম দিয়েছে পুণ্য। সেই পুণ্য আর যাই হোক সে শিব নয়। সেই সমাজবিধি আত্মার ধর্মকে পীড়িত করে। স্বলক্ষন্তু যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠউচ্যতে। আত্মার লক্ষণকে যে জানে সেই মুনি, সেই শ্রেষ্ঠ। আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি, যে শুভবুদ্ধিতে সকলকে এক করে।''

এই শুভবুদ্ধির প্রেরণায় ব্যক্তিমানব তার অহংসীমার মধ্যে যে সুখ-দুঃখ সেই সকলকে ছাড়িয়ে যায়, সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেশের জন্য, লোকহিতের জন্য বৃহৎ ভূমিকায় নিজেকে স্থাপন করে। কেননা 'আপনাকে বৃহতে উপলব্ধি করাই সত্য, অহংসীমায় অবরুদ্ধ জানাই অসত্য। ব্যক্তিগত দুঃখ এই অসত্যে।'

সত্যের আকর্ষণ বিরাটের আকর্ষণ এই বিরাট রুদ্ররূপে দুঃখের পথে আমাদের মুক্তির দিকে আকর্ষণ করেন। অপূর্ণতাকে ক্ষয় করে পূর্ণের সঙ্গে মিলনে বিশ্বমানব বিশুদ্ধ আনন্দময় হয়ে উঠবে। ব্যক্তি আত্মা থেকে বিশ্বাত্মা, বিশ্বাত্মা থেকে পরমাত্মার আহ্বানে ব্যক্তিমানব বিশ্বমানবের সঙ্গে মিলিত হয়ে ছুটে চলবে মহামানবতার দিকে। দুঃখবেদনার ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে মহাবিশ্ব-জীবনকে — সত্যকে লাভ করবার জন্য নির্ভয়-নিঃশর্ত আত্মসমর্পণেই পরিপূর্ণ সার্থকতা, সফলতা, আনন্দ। একটি কবিতায় মহামানবধর্মের এই ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য কবি লিখেছেন —

''মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা,
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তারি কাছে জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যাবে
জন্মজন্মধরি।
কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।''

'মানুষের ধর্ম গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপনিষদের তত্ত্ব-আশ্রিত দর্শনের সঙ্গে মানুষের ধর্মকে একাত্ম করেন। প্রসঙ্গ বিস্তার সূত্রে নানা পূর্বকথার অল্পবিস্তর পুনরাবৃত্তি সেখানে আছে। তবে তাঁর সঙ্গে অবশ্যই কবির মৌলিক অনুভবের দিকগুলি বিষয় বস্তুকে প্রাঞ্জল অভিব্যক্তি দান করেছে। এই সূত্রেই আমরা লক্ষ্য করতে পারি, একদিকে উপনিষদ্ দর্শন ও তার রবীন্দ্রভাষ্য, অন্য দিকে একেবারে নিরক্ষর সাধারণ মানুষের ধর্মকেন্দ্রিত

নিজস্ব উপলব্ধি। কী আশ্চর্য কুশলতায় তিনি তাদের মিলিয়েছেন। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, উপনিষদ্ কিম্বা বিশেষ কোনো ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ নিরক্ষর বাউল তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাও জীবনবোধ থেকে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে গানে গানে যে কথা বলছেন তার সঙ্গে উপনিষদের ঋষির কিম্বা তার আধুনিক ভাষ্যকর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির কী আশ্চর্য সুন্দর মিল।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন- প্রণীত 'বাংলার বাউল' গ্রন্থে সংকলিত বাউল গান ও কবির নিজস্ব বাউলগীতি সংগ্রহের মর্মার্থ অনুধাবন করে কবির মনে হয়েছিলো উপনিষদক ধর্ম, তাঁর অভিপ্রেত মানুষের ধর্ম ও অশিক্ষিত, অশাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু ঈশ্বরে নিবেদিতপ্রাণ ভক্ত বাউলের ধর্মবোধের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা বাউল বিশ্বাসে করেন, আমাদের প্রাণের দেবতা— ঈশ্বর যা ভগবান, তিনি বিরাজ করেন মানুষের মধ্যেই। তাঁকে বাইরে খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা, মূর্খতা। উপনিষদের ঋষিও তো বলেছেন ঐ কথাই। বৃহদারণ্যকে আছে - যে মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেই দেবতা অন্য আমি অন্য এমন কথা ভাবে, সে তো দেবতাদের পশুর মতোই —

''অথ যোহন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে

অন্যেহসৌ অন্যোহহম্ অস্মীতি

ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্।''

এই একই কথা শুনি অশাস্ত্রজ্ঞ, অশিক্ষিত বাউলের কণ্ঠে। তাঁর নিজের মতো করে নিজের ভাষায় তিনি বলেন, তিনি আপন দেবতাকে জেনেছেন আপনার মধ্যে। তিনিই তাঁর মনের মানুষ। সেই মনের মানুষকে জানতে হবে। চিনতে হবে। তাই তাঁর অকপট কাতরতা — 'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।' বাহ্যিক অনুষ্ঠান-আচার-পূজাপাঠের আড়ম্বর নেই। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দীর্ণ অহঙ্কার নেই, আছে কেবল ভক্তি, আছে আত্মনিবেদন। এতেই তাঁর আনন্দ। এই আনন্দ অহংমুক্ত আনন্দ, এই আনন্দই ভূমা। এই ভূমার উপলব্ধি কেবল মানুষেরই সাধ্য। কেন না মানুষের পক্ষে তাই সত্য। ভূমার এই উপলব্ধির বিষয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ভূমা আহারে বিহারে আচারে বিচারে ভোগে নৈবেদ্যে মন্ত্রে-তন্ত্রে নয়। ভূমা বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পূজোপচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ পালনে উপাসনা করা সহজ কিন্তু আপনার চিন্তায়, আপনার কর্মে, পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সবচেয়ে কঠিন সাধনা। সেই জন্যেই কথিত আছে, ন্যায়মাত্মা বলহীনের লভ্যঃ। তারা সত্যকে পায় না যারা অন্তরে দুর্বল। অহংকারকে দূর করতে হয়, তবেই অহংকে পেরিয়ে আত্মাকে পৌঁছতে পারি।—

য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোহবিজিঘৎ।

সোহপিপাসঃ সত্যকামং সত্যসংকল্পঃ সোহন্বেষ্টব্যঃ স বিজ্ঞিজ্ঞাসিতব্যঃ।।

আমার মধ্যে যে মহান আত্মা আছেন, যিনি জরা-মৃত্যুশোক-ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, যিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে, তাঁকে জানতে হবে।। 'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।' এই যে তাঁকে সন্ধান করা, তাকে জানা, এতো বাইরে জান, বাইরে পাওয়া নয়; এ যে আপন অন্তরে আপনি হওয়ার দ্বারা জানা, হওয়ার দ্বারা পাওয়া।

কেমন করে সেই অন্তরতম মানুষকে পেতে হবে? তাঁকে পেতে হলে চাই সুগভীর অর্ন্তদৃষ্টি। একেই উপনিষদ্ বলেছেন প্রজ্ঞা বা দিব্যদৃষ্টি। সুতরাং যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণ্য- আচার-আহার-বিহার মন্ত্র-তন্ত্রে না, প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে পেতে হবে তাকে 'প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।' যাকে বলি প্রজ্ঞা তা ব্যক্তিমানবের সংস্কারলব্ধ জ্ঞানের বাইরে। তাকে বলা যেতে পারে বিজ্ঞান। তাতে বিশ্বমানবের অধিকার, কেননা তা সকল মানবের শ্রদ্ধেয়। তেমনি মানুষের সার্থগত 'আমি'র (অহং) চেয়ে বড়ো যে আমি (আত্মা) তার সঙ্গেও সকলে ঐক্য, তার কর্ম সকলের কর্ম। কেননা 'একলা আমি কর্মই বন্ধন, সকল আমির কর্ম মুক্তি'। বাংলার সরলপ্রাণ বাউল ও তো এই পরম সত্যের উপলব্ধিটি প্রকাশ করলেন তাঁর গানে। তিনি কেবল 'মনের মানুষ' অন্বেষণের কথাটি বলেই ইতি টানলেন না, উপেয়ের সঙ্গে উপায়টিও বলে দিলেন - 'একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্বঠাঁই। ''সেই মানুষ সকল মনের মানুষ, আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া যায়। এই কথাই উপনিষদ্ বলেছেন; যুক্তাত্মানং সর্বমেবাবিশন্তি। বলেছেন তং বেদ্যং পুরুষং বেদ। যিনি বেদনীয় সেই পূর্ণ মানুষকে জানো; অন্তরে আপনার বেদনায় যাঁকে জানা যায় তাঁকে সেই বেদনায় জানো, জ্ঞানে নয়, বাইরে নয়।''

মানুষ সত্য হয়ে ওঠে পরম সত্যের উপলব্ধিতে। সত্যকে আপন করাই মানুষের সাধনা। মানুষের ইতিহাসে নানা সম্প্রদায়, নানা নাম, নানা সংকল্পের মধ্য দিয়ে এই সাধনাই চলছে। ''যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই আমার বলে সকলের মধ্যে জানা যে পরিমাণে আমাদের জীবনে আমাদের সমাজে উপলব্ধ হচ্ছে সেই পরিমাণেই আমরা সত্য মানুষ হয়ে উঠেছি। মানুষের রিপু মাঝখানে এসে এই সোহহম্ উপলব্ধিকে দুই ভাগ করে দেয়।'' সেইজন্যই উপনিষদের নির্দেশ - মা গৃধঃ — লোভ কোরো না। মানুষের ঈশ্বরপ্রদত্ত ভোগ্য বিষয় ছাড়া আর সকল ত্যাগ করো - 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জিথাঃ।' সকলেই জানেন যে ''লোভ বিশ্বের মানুষকে ভুলিয়ে বৈষয়িক মানুষ করে দেয়। যে ভোগ মানুষের যোগ্য তা সকলকে নিয়ে তা বিশ্বভৌমিক, তা মানুষের সাহিত্যে আছে, শিল্পকলায় আছে, তাই প্রকাশ পায় মানুষের সংসার যাত্রায়, তার হৃদয়ের আতিথ্যে। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলে অতিথি দেবো ভব। কেননা আমার ভোগ সকলের ভোগ এই কথাটা অতিথিকে দিয়ে গৃহস্থ স্বীকার করে; তবে ঐশ্বর্যের সংকোচ দূর হয়।... এই আতিথ্যের মধ্যে আছে, সোহহংতত্ত্ব — অর্থাৎ আমি তাঁর সঙ্গে এক যিনি আমার চেয়ে বড়ো। আমি তাঁর সঙ্গে মিলে আছি যিনি আমার এবং আমার অতিরিক্ত।''

আমাদের দেশের একদল সন্ন্যাসী সোহহং তত্ত্বকে নিজেদের মতো করে গ্রহণ করেন। 'নিরতিশয় নৈষ্কর্ম্য ও নির্মমতায় জড় প্রকৃতিকে লঙঘন কবার জন্যে দেহকে পীড়ন করেন। মানবপ্রকৃতিকে অস্বীকার করবার জন্যে তাঁরা যে কঠোর-কৃচ্ছ সাধনার পথ গ্রহণ করেন তা ব্রহ্মিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের না পসন্দ্। তাই তিনি বলতে পারেন — ''তাঁরা অহংকে বর্জন করেন যে অহং বিষয়ে আসক্ত, আত্মাকে অমান্য করেন যে আত্মা সকল আত্মার সঙ্গে যোগে যুক্ত। তাঁরা যাঁকে ভূমা বলেন তিনি উপনিষদে উক্ত সেই ঈশ নন যিনি সকলকে নিয়ে আছেন, তাঁদের ভূমা সবকিছু হ'তে বর্জিত, সুতরাম তাঁর মধ্যে কর্মতত্ত্বং নেই। তাঁরা মানেন না তাঁকে যিনি পৌরুষন নৃষু-মানুষের মধ্যে যিনি মনুষ্যত্ব, যিনি বিশ্বকর্মা মহাত্মা, যাঁর কর্ম খণ্ডকর্ম নয়, যাঁর কর্ম বিশ্বকর্ম, যাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ - যাঁর মধ্যে জ্ঞানশক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক, যে স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তিকর্ম অন্তহীন দেশে-কালে প্রকাশমান।'' আসলে মানুষের

অভিব্যক্তির গতি অন্তরের দিকে। এই দিকে তার সীমার আবরণ খুলে যাবার পথ। এইজন্যই মধ্যযুগের সন্ত কবি রজ্জব তার বাণীতে সারবার কথাটি বলেছেন —

সব সাঁচ মিলে সো সাঁচ হৈ, না মিলে সো ঝুঁঠ।

জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ।।

- সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলন না তা মিথ্যে; রজ্জব বলছে এই কথাই খাঁটি- এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই করো। মানুষ পবিত্র হয় নির্মল হয়, সুন্দর হয় এই সত্যবোধে - অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি'- দেহের শোধন হয় জল দিয়ে কিন্তু মনের শোধন হয় কেবল সত্যে।

উপনিষদের আরও একটি সুন্দর কথা - পাপ করে সন্তপ্ত হলেই সব পাপ ধুয়ে মুছে যায়, যে পাপ করেছি তা আর করবো না ভেবে দৃঢ়চিত্ত হলে মানুষ পবিত্র হতে পরে—

''কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপং প্রমুচ্যতে।

নৈবং কুর্যাম্ পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ।।

এই সকল কথা বলার মধ্য দিয়ে মানুষ স্বীকার করে নেয় বিশ্বমনের প্রজ্ঞাকে, কে না 'তং হ দেবম্ আত্মবুদ্ধি প্রকাশম্ — সেই দেবতা আত্মবুদ্ধি প্রকাশক, তাঁকে আমরা আত্মায় জানি। এ থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে ''আমার মন আর বিশ্বমন একই, এই কথাই সাধনার মূলে, আর ভাষান্তরে এই কথাই সোহহম্।'' সত্যসাধনার এই বোধে - সোহহম্ তত্ত্বটিকে আত্মস্থ করে ব্রাহ্মণ রামানন্দ বর্ণগত অহঙ্কার তুচ্ছ করে 'আলিঙ্গন করেছিলেন নাভা চণ্ডালকে, মুসলমান জেলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে,' বলেছিলেন সোহহম্। জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বুদ্ধ-খ্রীষ্ট প্রভৃতি সকলেই আপন সীমাকে ছাড়িয়ে অনুভব করেছিলেন বৃহৎ-মহৎ সত্যকে, বলেছিলেন সোহহম্। উপনিষদের সম্ভূতি-অসম্ভূতি তত্ত্বকে তাঁরা অন্তর দিয়ে বুঝে ছিলেন, এক সঙ্গে মেলাতে পেরেছিলেন। সম্ভূতি হল তাই যা দেশে-কালে অভিব্যক্ত আর অসুম্ভুতি হল তাই যা অসীমে অব্যক্ত। সম্ভূতি সীমার আর অসম্ভূতি অসীমতার দিকটিকেই ব্যক্ত করে। এই সীমা-অসীমের মিলনেই সত্যের বোধ, কবির নিজের অনুভবে দীপ্ত এই মিলন তত্ত্বটি—

''সীমার মাঝে, অসীম তুমি

বাজাও আপনা সুর।

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ

তাই এত মধুর।''

(গীতাঞ্জলি - ১২০)

বস্তুত মানুষের মধ্যে যিনি অসীম তাঁকে সীমার জীবনে সমাজে ব্যক্ত করে তুলতে হবে। অসীম সত্যকে বাস্তব সত্য করতে হবে। এর জন্য কর্মের প্রয়োজন। এইজন্য উপনিষদ বলেছেন কর্মের মধ্য দিয়েই শতবর্ষ বাঁচতে হবে। মানুষ এরই জন্যে সাধনা করে চলেছে। এই সাধনারই অন্য নাম সত্যসাধন- মনুষ্যত্বসাধন - মানুষের ধর্ম। এই

কর্মের মধ্যে সত্যবোধের তথা মনুষ্যত্বের জাগরণকেই বাউল বলেছেন লীলা, বলেছেন —

''জীবে জীবে চাহিয়া দেখি সবই যে তার অবতার—

ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি, যার নিত্যলীলী চমৎকার!

প্রতিদিনই মানবসমাজে এই লীলা। অসংখ্য মানুষ জ্ঞানে প্রেমে ত্যাগে নানা আকারেই অপরিমেয়কে প্রকাশ করছে।'' যুগে যুগে মহাপুরুষেরা বিচিত্র লীলার মধ্যে ঐক্যের এই বাণীটি বহন করে বলেছে— সোহহম্, বলেছে 'I am my Father are alone'. এই বোধে আত্মপ্রসাদ যেমন, আনন্দ ততোধিক। অভিব্যক্তির সকল স্তরেই আত্মবিকারে গূঢ়ার্থ নিহিত ছিলো, মানুষ তা উপলব্ধি করেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন —জগতের বিপুল অভিব্যক্তিকে প্রথম অর্থ দেখলুম প্রাণকণায়, তার পরে জন্তুতে, তার পরে মানুষে। বাহির থেকে অন্তরের দিকে একে একে মুক্তির দ্বার খুলে যেতে লাগল। মানুষ এসে যখন ঠেকল তখন যবনিকা উঠতেই জীবকে দেখলুম তার ভূমায়। দেখলুম রহস্যময় যোগের তত্ত্বকে, পরম ঐক্যকে। মানুষ বলতে পারলে, যাঁরা সত্যে জানেন তাঁর সর্বমেবাবিশন্তি — সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

আলোকের মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকিরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে। সেই প্রসারণের দিকে দেখি তার মহৎকে, দেখি মহামানবকে, দেখি যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষং সর্বানুভুঃ; এই শুভ কামনায় হৃদয়কে সর্বত্র এই বলে ব্যাপ্ত করতে পারি —

সবের সত্তা সুখিতা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু।

সব্বে সত্তা দুক্খাপমুঞ্চন্তু। সব্বে সত্তা মা যথালব্ধ-সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।—

সকল জীব সুখিত হোক, অবধ্য হোক, সুখী হয়ে কালহরণ করুক। সকল জীব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হোক, সকল জীব যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক।। সেয়ই সঙ্গে এও বলতে পারি, দুঃখ আসে তো আসুক, মৃত্যু হয়তো হোক, ক্ষতি ঘটে তো ঘটুক— মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক, সমস্ত দেশকালকে ধ্বনিত করে বলতে পারুক; সোহহম্।''

৩০২.২.৮.২ : মানুষের ধর্মের পরম উপলব্ধি : বাউলের অন্বেষা

মানুষ ছাড়া সকল প্রাণী বাইরে থেকে জীবিকার অন্বেষণে ব্যস্ত। কিছু মানুষ আপন অন্তরের মধ্যে আর একজনের অস্তিত্ব অনুভব করলে যিনি তাকে তার অন্তর্নিহিত অর্থসকল দিচ্ছেন। সেই অর্থ মানুষের আপন আত্মারই গভীর অর্থ। ''সেই অর্থে এই যে মানুষ মহৎ; তবেই প্রমাণ হবে যে সে মানুষ। প্রাণের মূল্য দিয়েও তার আপন ভূমাকে প্রকাশ করতে হবে; কেননা তিনি চিরন্তন মানব, সর্বজনীন মানব, তিনি মৃত্যুর অতীত, তাকে যে অর্ঘ্য দিতে হবে, যে অর্ঘ্য সকল মানুষের হয়ে, সকল কালের হয়ে আপনারই অন্তরতম বেদীতে।'' বাইরের সম্পদ, খ্যাতি, প্রভাব-প্রতিপত্তি , ভোগ- এ সকল নিয়েই তো মানুষের সঙ্গে মানুষের যত বিবাদ, যত দুঃখ যত কান্না। অন্তরের যে মানুষটি রয়েছেন অন্তরতম বেদীতে তার খোঁজ রাখি কই? এই মানুষকে পেতে হলে সীমায় আবদ্ধ সংকীর্ণ সার্থমগ্নতা

পরিহার করে বেরিয়ে আসতে হবে পথে। এই সার কথাটি, এই গভীর সত্য বোধটি ধরা পড়েছে নিরক্ষর - ভিখারী বাউলের একটি গানে—

''আমি কথাটি পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশ বেড়াই ঘুরে।''

সেই বাউলই অন্য একটি গানে বলেছিলেন - 'তোরই ভিতর অতল সাগর'।

মানুষ যে যথার্থ মহৎ, সে যে যথার্থ মানুষ যেখনে জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে সে বিশ্বের সঙ্গে, ভূমার সঙ্গে যুক্ত, তা তাকে প্রমাণ করতে হ'বে। মানুষের নিজের মধ্যে যে বৃহৎ-মহৎ মানবসত্তা রয়েছে যাকে বাউল বলেছেন 'মনের মানুষ'- তার অন্বেষণই মানুষের ধর্ম। তাই বাউল বলেছেন - 'মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ'। সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে —'আবিরাবীর্ম এধি'। ''পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃ প্রকাশ, আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।''

৩০২.২.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। প্রচলিত ধর্ম-সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্মের পার্থক্য নির্দেশ করো।

২। 'মানুষের ধর্ম'প্রবন্ধের অনুসরণে মানুষের ধর্মের স্বরূপ বিশদ করো।

৩। 'মানুষের ধর্ম' অবলম্বনে জীবদেহ ও বিশ্বদেহ, জীবভাব ও বিশ্বভাব এবং ব্যক্তিমন ও বিশ্বমন -সম্পর্কিত ধারণার পরিচয় দাও।

৪। মানুষের ধর্ম কেন্দ্রিত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বাউলের অন্বেষণকে মানুষের ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেছেন তা ব্যাখ্যা করো।

৫। 'মানুষের ধর্ম' সম্পর্কিত আলোচনায় 'মানব ধর্ম' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করো।

৬। 'মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ' - 'মানুষের ধর্ম' - গ্রন্থের আলোচনায় প্রেক্ষিতে উদ্ধৃতিটির গুরুত্ব নির্দেশ করো।

৭। ''স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিতে তপস্যার দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বলি মনুষ্যত্ব- মানুষের ধর্ম।''-আলোচনা করো।

৩০২.২.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। আত্মপরিচয় (বিশ্বভারতী সং) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। মানুষের ধর্ম (বিশ্বভারতী সং) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩।	*Religion of Man*	—	Rabindranath Tagore
৪।	*Sadhana*	—	Rabindranath Tagore
৫।	*Personality*	—	Rabindranath Tagore
৬।	বাংলার বাউল	—	ক্ষিতিমোহন সেন
৭।	*The Principle Upanishads*	—	Dr. S. Radhakrishnan
৮।	*Indian Philosophy*	—	Dr. S. Radhakrishnan
৯।	*Occasional Speeches and Writings*	—	Dr. S. Radhakrishnan
১০।	*Religion of the Forest*	—	Rabindranath Tagore
১১।	*Religion of the Artist*	—	Rabindranath Tagore
১২।	রবীন্দ্র দর্শন	—	হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩।	রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য	—	কল্যাণীশঙ্কর ঘটক
১৪।	সাহিত্যের বিশ্লেষণ - প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ	—	কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

লিপিকা

একক - ৯

লিপিকার গঠনশিল্প

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৩.৯.১ : পটভূমি

৩০২.৩.৯.২ : লিপিকার গঠনশিল্প

৩০২.৩.৯.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০২.৩.৯.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০২.৩.৯.১ : পটভূমি

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে যখন রবীন্দ্রনাথের শরীর অসুস্থ কোনো বড় কাজে হাত দিতে মন চায় না, তখন তিনি শান্তিনিকেতনে শিশুদের মধ্যেই নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছেন, কখনো লিখছেন শিশু ভোলানাথের ছড়া, একটি একটি ছড়া যাতে সমাকালীন সময় ও সমাজ একেবারে অনুপস্থিত এই সময়ই তাঁর মধ্যে কবিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার খেয়াল এল, এই খেয়াল - বহুদিন ভেবেছিলেন গদ্যকবিতার কথা - কখনো বলেছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে বা কখনো গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এবার নিজেই সচেষ্ট হয়ে উঠলেন।

ভারতে তখন ইংরেজ শাসনে দমননীতি কঠোর হয়ে উঠেছে, রাওলাট বিলের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ৩০শে মার্চ প্রতিরোধ আন্দোলনের সূচনা। ১৯১৯ এর ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর পুলিশের জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে গুলিবর্ষণ হয়। এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় ভারতীয় জনমানসে। রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ড্রুজের কাছ থেকে খবর পান, তিনি গান্ধী কিংবা চিত্তরঞ্জনের কাছে এর প্রতিবাদে কিছু করতে চান এবং কোনো সাড়া না পেয়ে নাইটহুড ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সময়েই তিনি ছিলেন 'লিপিকা'। তাঁর সমস্ত বিমর্ষচিত্তের ভার থেকে মুক্তির সন্ধানে তাঁর সজনশীল মন এই নতুন (আর্ট ফর্মের) শিল্পরূপের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিল।

৩০২.৩.৯.২ : লিপিকার গঠনশিল্প

লিপিকা রচনার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ এই গদ্যকবিতা রচনার জন্য বিশেষ প্রেরণা অনুভব করেন। ১৯৩২-এ প্রকাশিত পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখছেন - 'পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে বাংলা গদ্যে কবিতার

রস দেওয়া যায় কিনা তারই'' পরীক্ষা তিনি করেছিলেন লিপিকার 'অল্প কয়েকটি লেখায়'' তবে ''ছাপবার সময় সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি - বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ''। সাহিত্যের স্বরূপ প্রবন্ধ গ্রন্থে কাব্য ও ছন্দ প্রবন্ধটিতে (১৯৩৬এ লিখিত) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - ''কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা - পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক বা গদ্যে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে।''... ''ছন্দের একটা সুবিধা এই যে ছন্দের স্বতই একটা মাধুর্য আছে।'' ..''গদ্যই হোক, পদ্যই হোক, রচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে কিন্তু পদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলঙ্কার শাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখে না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়।'' ... ''কিন্তু এই সহজ কথাটা বলতেই হবে, যেটা যথার্থ কাব্য সেটা পদ্য হলেও কাব্য, গদ্য হলেও কাব্য।'' ...''যা আমাকে রচনাতীতের আস্বাদ দেয় তা গদ্য বা পদ্য রূপেই আসুক তাকে কাব্য বলে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হব না।''

এই বক্তব্যগুলি মনে রেখে লিপিকা রচনাগুলিকে বিচার করলে মনে হবে যে সত্যিই এগুলির অধিকাংশই গদ্যকবিতা, গদ্যের প্রবহমান রূপের মধ্যে প্রকাশিত অন্তর্লীন ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ কাব্য। শ্রেষ্ঠকাব্যের সঙ্গে রসাবেদনের দিক দিয়ে তার কোনো প্রভেদ নেই অথচ উপকরণে, আয়োজনে সজ্জায় তা নিঃসন্দেহে গদ্যের সহোদর। তার অন্তর্লীড় ব্যঞ্জনাকে লক্ষ্য করে কোনো কোনো সমালোচক এর নাম দিয়েছেন 'গীতিগদ্য'। লিপিকা গ্রন্থটির জন্য স্বয়ং রচয়িতা কোনো ভূমিকা লেখেননি তবু এ গ্রন্থটি হাতে নিলে দেখা যায় এই নবরূপের রচনাগুলির মধ্যে তিনি সূক্ষ্মভাবেই তিনটি ধারারাকে একত্রিত করেছেন। রচনাক্রমের মধ্যে ১,২,৩ পর্বে রচনাগুলিকে বিন্যস্ত করেছেন। লিপিকার রচনাগুলির মধ্যে প্রথম পর্বের রচনা যেগুলি '১' শিরোনামের অন্তর্গত তার মধ্যে যে রচনাগুলি আছে সেগুলি বিশেষভাবেই ভাবমুখ্য এবং ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ এগুলিকে গদ্যকবিতা মনে করাই সংগত।

দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলিতে কাব্যের ব্যঞ্জনার চেয়ে ছোট গল্পের ক্ষীণ আভাস, ঘটনার ছোট পরিসর বর্ণিত হয়েছে। ছোটগল্পের সঙ্গে কবিতার যে মিল — ছোটগল্পের পরিণতির কাব্যিক ব্যঞ্জনা তাও এখানে দুর্লভ নয়। তাই এই রচনাগুলি নতুন ধরনের গল্পশিল্প। গল্পগুচ্ছের থেকে এই গল্পগুলি অবশ্য স্বতন্ত্র, গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি বিষয়মুখ্য এবং লিপিকার গল্পগুলি ভাবমুখ্য। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা অবশ্য লিপিককাকে গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির সঙ্গে এক করতে চাননি। তাদের গঠনগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এই গল্পর চরিত্র স্বল্প, ঘটনার গতি মন্থর এবং গল্পের বিস্তারও অনেক কম। দ্বিতীয় পর্বের অধিকাংশ রচনাই এই পর্বের, মীন, সুয়োরানীর সাধ, নামের খেলা। গল্পগুচ্ছের যে গল্পগুলি আকারে ছোট সেগুলোর মধ্যে একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় কিন্তু লিপিকার গল্পগুলির আকৃতি সচেতন প্রয়াসে সংক্ষেপিত হয়নি। সমালোচক বলেছেন - ''বরং ভাবই যেন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে এক একটি মুক্তা কণিকার মতো শিল্পরূপে সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা পেয়েছে। স্বরূপধর্মে গল্পগুচ্ছর গল্প সাধারণতা বস্তুমুখ্য, লিপিকার গল্প ভাবমুখ্য। এই ভাব কোথাও রূপকের শিল্পরূপে সুনির্দিষ্ট, কোথাও বা প্রতীকের শিল্পরূপে অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনাময়।'' (রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ : তপোব্রত ঘোষ)।

তৃতীয় পর্বের কয়েকটি রচনায় গল্পরস প্রাধান্য পেয়েছে আবার কয়েকটি রচনায় নাটকীয় চমকও লক্ষণীয়। বিশেষ করে ব্যঙ্গ রসের কাহিনি এই পর্বের রচনাগুলিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। তোতাকাহিনি, ঘোড়া, কর্তার ভূত প্রভৃতি রচনাকে নাট্যলক্ষণাক্রান্ত বলা যায়। এইভাবে 'লিপিকা' নামের একটি গ্রন্থে তিনটি ধারার রচনা মিলে মিশে আছে। ১,২,৩ এই পর্বে ভাগ করতে গিয়ে লেখকের এই অন্তরালবর্তী অভিপ্রায়টিই টের পাওয়া যায়। সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ''কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ'' গ্রন্থে বলেছে যে সূর্যাস্তর সময়ে গাছের ডালে বসে থাকে নানা জাতের পাখি এবং তাদের দেখে পৃথক করা যায় না, অথচ সূর্যোদয়ের সময়ে দুই ভিন্ন দিকে দুই জাতের পাখি। লিপিকার রচনাগুলি এমনই।

৩০২.৩.৯.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'লিপিকা' কাব্যটি কত সালে রচিত হয়।

২। 'লিপিকা' কাব্যের গঠনশিল্পের স্বরূপ বর্ণনা করো।

৩০২.৩.৯.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ — তপোব্রত ঘোষ।

৩। রবীন্দ্র ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

৪। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প — প্রমথনাথ বিশি

পর্যায় গ্রন্থ - ৩
একক - ১০
প্রথম পর্বের রচনা --- কাব্যলক্ষণাক্রান্ত পাঠ বিশ্লেষণ

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৩.১০.১ : প্রথম পর্বের রচনা --- কাব্যলক্ষণাক্রান্ত পাঠ বিশ্লেষণ

৩০২.৩.১০.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০২.৩.১০.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০২.৩.১০.১ : প্রথম পর্বের রচনা --- কাব্যলক্ষণাক্রান্ত পাঠ বিশ্লেষণ

১। **'পায়ে চলার পথ'** — রচনাটি প্রথমে পড়লে মনে হবে বিবৃতিমূলক। গ্রামের মেঠো পথের বর্ণনা, তারপরে এই পথের বর্ণনা ক্রমশ অনুভূতিময়তায় সান্দ্র হয়ে উঠেছে। ক্রমশঃ মনে হয় এই বর্ণনা শুধু বাইরের বর্ণনা নয়, জীবন পথ। কবি বলেন — ''একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার, এখন দেখছি, কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলবার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।'' ...''এ যে চলার পথ ফেরার পথ নয়। কখনো কবির কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে যে পথ যেন তার বুকে বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী যে সুর ধ্বনিত করে। ''ওগে পায়ে তলার পথ, অনেক কালের অনেক কথাকে তোমার ধূলিবন্ধনে বেঁধে নীরব করে রেখো না। আমি তোমার ধূলোয় কান পেতে আছি, আমাকে কানে-কানে বলো।'' এই আর্তি এই গদ্যরচনাকে কাব্যের জগতে উত্তীর্ণ করেছে। আর এই রচনার শেষাংশে কবির দার্শনিক জিজ্ঞাসা- ''পথ কি নিজের শেষকে জানে, যেখানে লুপ্ত ফুল আর স্তব্ধ গান পৌঁছল, যেখানে তারার আলোয় অনির্বাণ বেদনার দেওয়ালি উৎসব।''

জীবনের পথের পথিক যে, সে তার চলার শেষ পরিণতিকে জানে না, কিন্তু বেদনার যে দহন তার অনিঃশেষ দেওয়ালি যেন কবির বেদনাময় অস্তিত্বকে অনির্দেশ্য করে তুলেছে।

এই অন্তর্লীন ব্যঞ্জনাময়তাই এই রচনার প্রাণ যা এই রচনাকে কাব্য করে তুলেছে। রসাবেদনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিচার করলে একে বাক্য ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না।

২। **'সন্ধ্যা ও প্রভাত'** — এই রচনাটির মধ্যেও সহজ প্রবহমান গতিশীল গদ্য - কিন্তু তারই মধ্যে পৃথিবী দুই প্রান্তে দুটি কালিক ব্যবধান যেন ব্যঞ্জনায় দুটি পৃথক জগৎকে আভাসিত করেছে। দিবা এবং রাত্রি, ঊষা এবং সন্ধ্যা পৃথিবীর দুটি সত্যকে জীবনের দুটি প্রান্তকে দ্যোতিত করে। কবি বলেছেন যে রচনা রচনাতীতের আস্বাদ দেয় তাকেই তিনি মনে করেন যখন 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' রচনায় ফুটে ওঠে — ''অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠেছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো; কোন্‌খানে ফুট্‌লো ভোরবেলাকার কনকচাঁপা?

জাগলো কে? নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায় জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া। এই বর্ণনার মধ্যে যে ব্যঞ্জনা আছে তাতে দুই পৃথিবী 'ইহলোক আর পরলোকের চিত্র ফুটে উঠেছে।'' একদিকে জীবনের জয়রথ অন্যদিকে মৃত্যু পথযাত্রীর যাত্রার সূচনা। আর পরিশেষে ''সূর্যদেব তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক। এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।'' এই জন্ম এবং মৃত্যুর দুটি পরিণতিকে কবি সমদূরত্বসম্পন্ন সহজ প্রেক্ষণ বিন্দুতে মিলিয়ে দিতে চান, 'আসা যাওয়ার খোলা রবে দ্বার' - সেই খোল দরজায় 'এর ছায়া ওর আলোর মিলন যেন।' মৃত্যু আর কোনো রহস্যময় দূরের জগতের ভয়ংকর সত্য নয়, সে কেবল একটি আলো ছায়ার মিলন। এওতো সেই বচনাতীতের প্রকাশ।

'কৃতঘ্ন শোক', 'সতেরো বছর' — এই দুটি রচনাতেও জীবনের শেষে মৃত্যুর প্রকাশ কেমন গভীর তাৎপর্যসহ তাই প্রকাশিত। দুটি রচনাতেই কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনে ঘটে যাওয়া সেই অভাবিত শোককাহিনিটিই সেই বউঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু জনিত শোকের একটা ইঙ্গিত আছে। সেই শোক শুধু নঞর্থক শোক নয়, সেই শোক থেকে এক অমলিন সৌন্দর্যময় জীবনোপলব্ধির প্রকাশ লক্ষণীয়, 'কৃতঘ্ন শোক' -রচনায় কবির মন যখন শোকের আঘাতে বিশ্বের সবকিছুতেই যা একান্ত আপনার তাকেই মনে করেছিল 'বিশ্বাসঘাতক' - অমনি কে যেন বলে উঠল 'অকৃতজ্ঞ'। ''জানলার বাইরে দেখি ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠেছে, যে গেছে যেন তারই হাসির লুকোচুরি। তারা ছিটিয়ে দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভৎর্সনা এল, ''ধরা দিয়েছিলেন সেটাই কি ফাঁকি, আড়াল পড়েছে এইটেকেই তে জোরে বিশ্বাস?''

অর্থাৎ যা আড়ালে পড়েছে তা কোথাও হারিয়ে যায়নি শেষ হয়নি, কেবল যেন তার চেহারা বদলে গেছে, জানলার বাইরে ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদের হাসির মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে সেই চিরচেনা হাসিটি। যাকে হারিয়ে কবির বেদনা হয়েছিল প্রগাঢ় আবার তাকে অন্যভাবে উপলব্ধি করে তাঁর শোক যেন কৃতার্থ হল, উত্তরণের পথে।

'সতেরো বছর'— শীর্ষক রচনাটিও ভাবমুখ্য রচনা। কত অনুষঙ্গে ভরা এ জীবন অনুভূতির স্তর পরম্পরা দিয়ে গড়া। সেই ''সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া; কখনো আদরে কখনো অনাদরে, কখনো কাজে কখনো অকাজে, কখনো সবার সামনে কখনো একলা আড়ালে, কেবল একটি লোকের মনে-মনে জানা দিয়ে গড়া; সেই মানুষ।'' কিন্তু মৃত্যু যা চিরকালীন বিচ্ছেদ তাই ধরে রাখে ''দিনগুলি, রাতগুলি, সেই নামের রাখিবন্ধনে আর তো এক হয়ে মেলে না - এরা ছড়িয়ে পড়ে।'' ''সন্ধ্যেবেলাকার খাপছাড়া মেঘের মতো অন্ধকারে পাড়ি দেয়''— এই অন্ধকার বিচ্ছেদের অন্ধকার যেখানে সব স্মৃতির মেঘ খাপছাড়া হয়ে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতি হিসে,বে তো আর বিশিষ্ট থাকে না, মূল্যহীন হয়ে পড়ে নির্বিশেষের মধ্যে। স্মৃতিভাবাতুর কবির বিষণ্ণতাই এখানে বড়ো, গদ্য হয়েও তাই তা বাক্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনাকেই প্রকাশ করে।

৩০২.৩.১০.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'লিপিকা'র অন্তত তিনটি রচনা অবলম্বনে দেখাও সেগুলিকে ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত করা যায় কিনা।

২। 'তোতাকাহিনি' ও ঘোড়ায় যথাক্রমে সমকালীন শিক্ষা সমাজ-অভিঘাতের যে ছায়াচিহ্ন ধরা আছে আলোচনায় তা স্পষ্ট করো।

৩। লিপিকার গদ্যকবিতার ছন্দ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। লিপিকার আখ্যানধর্মী কথিকাগুলিতে লেখকের যে সমাজ ভাবনার পরিচয় আছে - পঠিত রচনাগুলি অবলম্বনে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করো।

৫। লিপিকার আখ্যানধর্মী কথিকাগুলিতে লেককের যে সমাজ ভাবনার পরিচয় আছে - পঠিত রচনাগুলি অবলম্বনে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করো।

৬। লিপিকার কোনো একটি রচনার ভাববস্তু ও শিল্পরীতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭। লিপিকার কয়েকটি রচনা ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত - উপযুক্ত উদ্ধৃতিযোগে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠা করো।

৮। ''লিপিকা (১৩২৯) রবীন্দ্রাথের একখানি দেসরহীন অসাধারণ গদ্য গ্রন্থ'' -রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ধারায় লিপিকা কোন্ অর্থে কেন 'লিপিকা' দোসরহীন। তার অভিনব শিল্প প্রকরণ সম্পর্কে আলোচন করে গ্রন্থটির গোত্র নির্ণয় করো।

৯। গ্রন্থকার 'লিপিকা'কে তিনটি পর্বে ভাগ করে উপস্থাপিত করেছেন। এই বিভাজন কতটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

১০। 'লিপিকা'র কয়েকটি রচনা রূপকথার ছাঁদে লেখা - দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করো।

৩০২.৩.১০.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ — তপোব্রত ঘোষ।

৩। রবীন্দ্র ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

৪। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প — প্রমথনাথ বিশি

পর্যায় গ্রন্থ - ৩
একক - ১১
দ্বিতীয় পর্বের রচনায় গল্পরসের প্রাধান্য

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৩.১১.১ : দ্বিতীয় পর্বের রচনায় গল্পরসের প্রাধান্য

৩০২.৩.১১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০২.৩.১১.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০২.৩.১১.১ : দ্বিতীয় পর্বের রচনায় গল্পরসের প্রাধান্য

'মীনু' — মীনু পশ্চিমের খোলা মাঠ, অড়রখেত আর গাছের তলায় ছেলেবেলা কাটিয়েছেন। ''কাঁচা ফলটির মতো ওর কাঁচা প্রাণা পৃথিবীর বোঁটা শক্ত করে আঁকড়ে ছিল। যা কিছু ছিল কবি, সবুজ সজীব তার পরেই ওর বড়ো টান।'' ''ওর বাগানটি যেন তার কোলের ছেলে।'' আর সে ভালবাসতো তার পোষা কুকুর ভোঁতাকে। সে আরোগ্যলাভের জন্যই কলকাতায় এসেছিল। কিন্তু এই শহরে ইঁটকাঠের মধ্যে যে সব মানুষকে সে তার পরিবেশে পেয়েছিল, তার সঙ্গে তার মেলেনি। তার শোবার ঘরের নীচে গোলকচাঁপার গাছ সাজি হাতে নির্মম পূজারি ব্রাহ্মণের হাত থেকে বাঁচানো যায় না। তেমনি, পাশের বাড়ির ছোট্ট শিশুটিকে সে কোলে নিতে পারেনি। দাই এর হাত দিয়ে তার দেওয়া সন্দেশ শিশুটির অভিভাবকেরা কেড়ে নিয়ে শিশুটিকে মারল। সে মার বেশী বাজল মীনুকেই। তার মনের আশ্রয় একটির পর একটি যখন তার আয়ত্তের বাইরে তখন সে তার স্বামীকে কলকাতা থেকে চলে যাবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছে।

— এ গল্পটি একটি ভালবাসতে চাওয়া ব্যর্থ মেয়ের বেদনাময় কাহিনি। আর নিজের সন্তান বাঁচেনি, তার মাতৃত্ব চরিতার্থতা পায়নি, সে পাশের বাড়ির শিশুটিকেও কোলে নিতে পারেনি। প্রকৃতিতে সে ভালবাসে, কিন্তু ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অত্যাচার থেকে সে রক্ষা করতে পারেনি গোলকচাঁপার গাছটিকে, — এখান থেকে সে তাই চলে যেতে চেয়েছে। এই গভীর বেদনাবোধ এই রচনাটির আবেদন — যা ক্ষুদ্র রচনাটির গল্পরস হিসেবেই পরিবেশিত।

নামের খেলা — এটিরও গল্পবেদন মুখ্য। ছোট বড়ো সব মানুষই নিজের নাম প্রচার করতে ভালবাসে। ছোট ছেলেটি কানাই যখন তার মামার নামে ছাপা বইগুলো অসংখ্য তার বাড়িতে দেখলো তখন থেকে তারও নিজের নাম প্রচার করা ইচ্ছে। সে ইস্কুলের পাশের ছাপাখানার থেকে নিজের নামের কয়েকটা ছোটবড়ো সীসের অক্ষর জুটিয়ে এনে তাতে কালি লাগিয়ে যে বই পাচ্ছে তারউপর নিজের নাম ছাপাচ্ছে মামার ছিল মাত্র তিনটে

বইতে নাম, ভাগনের নাম উঠল পঁচিশটা বইতে। ভাগনের এই খেলা মামার মনে রাগ তৈরী করেছে। হয়তো এই নামের খেলার মধ্যে যে নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পেয়েছে সেটায় মামা নিজের নামের মোহের কথা ভাবেননি। মামা কানাইয়ের প্রতি রূঢ়তাবশতঃ নামের অক্ষরগুলি কেড়ে নিলেন। কানাই যত কাঁদতে লাগল- ক্ষীরের পুলি কিংবা রেলগাড়ি কোনো কিছুতেই সে শান্ত হোল না।

এদিকে মামা চেয়েছিলেন তাঁর নিজের লেখা নাটক শহরে মঞ্চস্থ করা যাবে -তাঁর বন্ধু এ প্রস্তাব নিয়ে শহরে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন - থিয়েটারের ওরা রাজী হন না। মামা একেবারে সর্বস্ব দিয়ে পণ করে বসলেন যে যেভাবে পারেন থিয়েটার খুলবেনই। মনে মনে স্পষ্ট দেখতে লাগলেন যে ''রাস্তায় গলিতে গলিতে তার নিজের নামে আর নাটকের নামে যেন শহরের গায়ে উল্কি পরিয়ে দিয়েছে।''

মামা আর ভাগনে প্রাপ্তবয়স্ক এবং বালক দুজনকেই আকর্ষণ করেছে নাম প্রতিষ্ঠা- 'নামের খেলা' এর ভিতর দিয়ে রচয়িতা নামমোহগ্রস্ত ব্যক্তির স্বরূপকেই কৌতুকস্নিগ্ধ করে দেখিয়েছেন।

গল্পরস এই রচনাগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে, একথা মেনে নেওয়া যায় নিঃসন্দেহে।

রাজপুত্তুর, উপসংহার, সিদ্ধি, মুক্তি, পরীর পরিচয়, প্রথম চিঠি, সুযোরানীর সাধ প্রভৃতি রচনাগুলিতে গল্পরসের পরিপূর্ণতা আছে, অথচ বচনাতীতের অনুভব। কাহিনি বীজ রয়েছে এই রচনাগুলির মধ্যে কোথাও রূপকথার আদল, কোথাও উপন্যাসের সুপ্ত সম্ভাবনা তবু পৃথক রচনা হিসেবে রস পরিবেশনের পূর্ণতায় বিশিষ্ট হয়েছে। গদ্য কবিতা ধীরে ধীরে অতি ছোট ছোট গল্প বা 'গল্পস্বল্প' হয়ে সার্থকতা পেয়েছে।

৩০২.৩.১১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'লিপিকা'র অন্তত তিনটি রচনা অবলম্বনে দেখাও সেগুলিকে ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত করা যায় কিনা।

২। 'তোতাকাহিনি' ও ঘোড়ায় যথাক্রমে সমকালীন শিক্ষা সমাজ-অভিঘাতের যে ছায়াচিহ্ন ধরা আছে আলোচনায় তা স্পষ্ট করো।

৩। লিপিকার গদ্যকবিতার ছন্দ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। লিপিকার আখ্যানধর্মী কথিকাগুলিতে লেখকের যে সমাজ ভাবনার পরিচয় আছে - পঠিত রচনাগুলি অবলম্বনে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করো।

৫। লিপিকার আখ্যানধর্মী কথিকাগুলিতে লেককের যে সমাজ ভাবনার পরিচয় আছে - পঠিত রচনাগুলি অবলম্বনে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করো।

৬। লিপিকার কোনো একটি রচনার ভাববস্তু ও শিল্পরীতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭। লিপিকার কয়েকটি রচনা ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত - উপযুক্ত উদ্ধৃতিযোগে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠা করো।

৮। ''লিপিকা (১৩২৯) রবীন্দ্রাথের একখানি দেসরহীন অসাধারণ গদ্য গ্রন্থ'' -রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ধারায়

লিপিকা কোন্ অর্থে কেন 'লিপিকা' দোসরহীন। তার অভিনব শিল্প প্রকরণ সম্পর্কে আলোচন করে গ্রন্থটির গোত্র নির্ণয় করো।

৯। গ্রন্থকার 'লিপিকা'কে তিনটি পর্বে ভাগ করে উপস্থাপিত করেছেন। এই বিভাজন কতটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

১০। 'লিপিকা'র কয়েকটি রচনা রূপকথার ছাঁদে লেখা - দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করো।

৩০২.৩.১১.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ — তপোব্রত ঘোষ।

৩। রবীন্দ্র ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

৪। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প — প্রমথনাথ বিশি

পর্যায় গ্রন্থ - ৩
একক - ১২
তৃতীয়পর্ব : সমাজ সচেতন ব্যঙ্গ রূপক

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৩.১২.১ : তৃতীয়পর্ব : সমাজ সচেতন ব্যঙ্গ রূপক

৩০২.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০২.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০২.৩.১২.১ : তৃতীয়পর্ব : সমাজ সচেতন ব্যঙ্গ রূপক

লিপিকার তৃতীয় পর্বের প্রথম তিনটি রচনায় সমাজ সচেতন লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষণীয়। ব্যঙ্গ থাকলেও এই রচনাগুলি সরস, কোথায় কোনও তীব্রতা অনুভূত হয় না, বরং বৈদগ্ধ ও বাক্‌চাতুর্য নির্ভর ব্যঙ্গের সূক্ষ্মতা অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়েছে। তোতাকাহিনি ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের আবাল্য সঞ্চিত বিদ্যালয় সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ও তাঁর গৃহেও পঠন পাঠনের আয়োজন তাঁকে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধী করে তুলেছে। এই প্রচলিত ব্যবস্থার বিকল্প ব্যবস্থার অনুসন্ধান করেছেন তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। আর সাহিত্যিক সত্তায় সমকালীন শিক্ষানীতির বিরোধীতা করেছেন - 'তোতাকাহিনি' রচনা করে। যা একালেও সমানভাবেই প্রাসঙ্গিক। 'তোতাকাহিনি' লিপিকার একমাত্র রচনা যা সাধুভাষায় রচিত। শিক্ষাব্যবস্থার স্থূলতা ও অসারতা দেখান এবং রাজা শিক্ষাব্যবস্থার ভণ্ডামিকে প্রকট করাই এর উদ্দেশ্য তাই এই সাধুভাষার ব্যবহার। 'তোতাকাহিনি' তোতাকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা— সেজন্য প্রথমে একটি শক্ত খাঁচা তৈরী, এরপরে স্যাকরাকে দিয়ে দামী সোনার খাঁচা বানানো, এর পরে পণ্ডিতেরা, পুঁথি লেখকেরা পাখির পাঠ্য তৈরী করলেন, রাজা ভাগিনারা খবরদারি করে, খাঁচাটার মেরামত পালিশ লেগেই থাকে, খাঁচায় দানা-পানি নেই, কেবল রাশি পুঁথির পাতা ছিঁড়ে কলমের ডগা দিয়ে পাখির মুখে ঠাসা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পাখিটি কেবল ডানা ঝটপট করে, সকাল বেলার আলোর দিকে চায় — এরই শিক্ষার এত আয়োজন অকৃতজ্ঞের মতো ব্যর্থ করে পাখিটি মরে গেল। রাজার ভাগিনা বলল, ''পাখিটির শিক্ষা পুরো হইয়াছে। পুরোদস্তুর সমারোহময় পঠন পাঠন পদ্ধতিটি সে স্বাভাবিক প্রাণশক্তির বিরোধী, এবং প্রাণের গতিকে রুদ্ধ করে শিক্ষা সম্ভব নয় এই স্বাভাবিক সত্যটাই

সমাজের গণ্যমান্যদের বিশেষ করে যাঁরা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের বিশেষভাবে অনুধ্যেয়। ব্যঙ্গরূপক গল্প হিসেবে তোতাকাহিনি অসামান্য শিল্প সার্থকতা পেয়েছে।

'কর্তার ভূত'- বিচার বিবেচনাকে বাদ দিয়ে যে ইহবিমুখতাকে ভারত ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করে চিরকাল গর্ব করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের উপর চাপিয়ে দেয় এটাই সেই 'ঘুম', জাগরণের চেয়েও যা প্রাচীনতম। ''মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।'' ... তাই 'দেশশুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ বুজে চলে।'' সমকালীন ভারতীয়দের এই ভূতগ্রস্ততাই লেখকের বিদ্রুপের বিষয় হয়েছে।

'ঘোড়া'- সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নানা বৈচিত্র্য দিয়ে নানা জীবের সৃষ্টি করেন সে অনুযায়ী জীবেনর গুণাবলীও পৃথক হয়। ঘোড়া তৈরী হোল মরু আর ব্যোম দিয়ে। অর্থাৎ শূন্যতা ও বায়ু হল তার প্রধান উপাদান। ঘোড়াকে দৌড়বার জন্য দিলে অবারিত মাঠ। কিন্তু মানুষের তার গতিকে নিজেদের কাজে লাগাবে বলে তাকে ছোট জায়গায় বেঁধে, তার সামনের পা দুটো আটকে রাখল। ঘোড়া তার নিজস্ব চলন হারিয়ে মানুষের ক্রীতদাস হয়ে রইল। এই ঘোড়াকে নিয়েই মানুষ তার উন্নতির জয়রথ নিয়ে অগ্রসরমান। মানুষের স্বার্থপরতা, বিবেকহীনতা এবং নির্মমতাই উদঘাটিত হয়েছে এই রচনায়। ভারতে ইংরেজ শাসন ও অবদমন নিপীড়ন যেন ঘোড়া রচনাটির মধ্যে বিশিষ্টতা পেয়েছে। এই ব্যঙ্গরূপক রচনায় লিপিকার বৈচিত্রময় সম্পূর্ণতা, প্রকাশিত হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়টি মিশ্র আবেদনের রচনায় সজ্জিত। রূপকথা থেকে গদ্যকবিতা, স্বল্পগল্প এসব মিলিয়েই লিপিকা বাংলা গদ্যকবিতার পরিসরকে অনেক প্রসারিত করেছে।

৩০২.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'লিপিকা'র অন্তত তিনটি রচনা অবলম্বনে দেখাও সেগুলিকে ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত করা যায় কিনা।

২। 'তোতাকাহিনি' ও ঘোড়ায় যথাক্রমে সমকালীন শিক্ষা সমাজ-অভিঘাতের যে ছায়াচিহ্ন ধরা আছে আলোচনায় তা স্পষ্ট করো।

৩। লিপিকার গদ্যকবিতার ছন্দ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। লিপিকার আখ্যানধর্মী কথিকাগুলিতে লেখকের যে সমাজ ভাবনার পরিচয় আছে - পঠিত রচনাগুলি অবলম্বনে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করো।

৫। লিপিকার আখ্যানধর্মী কথিকাগুলিতে লেককের যে সমাজ ভাবনার পরিচয় আছে - পঠিত রচনাগুলি অবলম্বনে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করো।

৬। লিপিকার কোনো একটি রচনার ভাববস্তু ও শিল্পরীতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭। লিপিকার কয়েকটি রচনা ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত - উপযুক্ত উদ্ধৃতিযোগে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠা করো।

৮। ''লিপিকা (১৩২৯) রবীন্দ্রাথের একখানি দেসরহীন অসাধারণ গদ্য গ্রন্থ'' -রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ধারায় লিপিকা কোন্ অর্থে কেন 'লিপিকা' দোসরহীন। তার অভিনব শিল্প প্রকরণ সম্পর্কে আলোচন করে গ্রন্থটির গোত্র নির্ণয় করো।

৯। গ্রন্থকার 'লিপিকা'কে তিনটি পর্বে ভাগ করে উপস্থাপিত করেছেন। এই বিভাজন কতটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

১০। 'লিপিকা'র কয়েকটি রচনা রূপকথার ছাঁদে লেখা - দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করো।

৩০২.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ — তপোব্রত ঘোষ।

৩। রবীন্দ্র ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

৪। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প — প্রমথনাথ বিশি

পর্যায়গ্রন্থ-৪

ছিন্নপত্র

একক-১৩

ছিন্নপত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৪.১৩.১ ভূমিকা

৩০২.৪.১৩.২ ছিন্নপত্র ও সমসাময়িক রবীন্দ্ররচনা

৩০২.৪.১৩.৩ ছিন্নপত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৩০২.৪.১৩.৪ ছিন্নপত্রে বিধৃত বিষয়বৈচিত্র্য

৩০২.৪.১৩.৫ উপসংহার

৩০২.৪.১৩.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩০২.৪.১৩.৭ সহায়ক গ্রন্থ

৩০২.৪.১৩.১ ভূমিকা

চিঠিপত্রে আমরা সাধারণভাবে যে আলাপচারিতার কথা অনুসন্ধান করে থাকি রবীন্দ্রনাথের চিঠি সেই অর্থে পৃথক এক নতুন অভিমুখ উন্মোচিত করে। বলা ভালো রবীন্দ্রনাথকে পরিপূর্ণরূপে জানতে হলে শুধু সাহিত্যসৃষ্টি দিয়ে বা ব্যক্তিগত কৃতকর্মের দিক থেকে দেখলে চলে না। সেইক্ষেত্রে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে জানতে ও বুঝতে হলে তাঁর চিঠিপত্রের আশ্রয় নেওয়াটা আমাদের কাছে একটি বিকল্প পথ। অগণিত পত্রধারার মধ্যেই গোপন আছে রবীন্দ্রজীবনকাহিনির বিশেষ বিশেষ কথাগুলি ও ভাবনার অনুভূতিগুলি। অতিসংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ কবির মানসলোকের পথ অনুসন্ধান করতে হলে তাই তাঁর পত্রসাহিত্য পাঠের এতো গুরুত্ব! পত্রধারার মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে জীবনের মণিমুক্তার সম্ভার। কবির সেই ইন্দ্রপুরীর সংবাদ পেয়ে যেতে পারি ছিন্নপত্রের মধ্যে।

ছিন্নপত্র সমগ্র বাংলাসাহিত্যে নিজস্ব গরিমায় পরিচিত। তার আঙ্গিক, নান্দনিক তাৎপর্য সমগ্র বাংলাসাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা আমাদের মুগ্ধ করে। পত্রগুচ্ছের স্বাদবৈচিত্র্যে কবিমানসের অন্তঃপুরে খবর আমরা সহজেই পেয়ে থাকি। ব্যক্তি মানুষকে চেনা এবং জানা-র থেকে বড়ো স্থান আর কোথাও হতে পারে না ! রবীন্দ্রমানসের অন্তরঙ্গ মুহূর্তটিকে এইপ্রকরণে উপস্থাপিত হতে দেখে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত! চিঠিপত্রের মধ্যে একটি জাতির পরিচয়, সমাজের সামগ্রিক রূপ ও ব্যক্তিগত পত্রলেখককে যেভাবে পাওয়া যায়; আর অন্যত্র বা ভিন্ন সাহিত্যপ্রকরণে ততখানি প্রাপ্তিযোগ সম্ভব নয়। তাই মূলধারার সাহিত্যপাঠে যে তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া গেল না; তার অনেকাংশ পূরণ করে দিতে সক্ষম এই চিঠিপত্র বা পত্রসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই চিঠিপত্রের আদানপ্রদানের মাধ্যমগুলি শুধুই ব্যক্তিগত ও সাহিত্যবোধের পরিচয়ই বহন করেনা; তার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের স্পর্শ সম্বলিত দেশ কাল ও বৌদ্ধিক বিকাশস্বরূপ দর্শনের কথাও উপস্থাপিত হয়। তাই এইধরনের পত্র কেবল প্রয়োজনের তাগিদ মিটিয়ে দিলেই হিসেব শেষ হয় না; তার সঙ্গে চিরন্তনকালের স্পর্শ বিজড়িত থাকায় তা হয়ে ওঠে দেশ ও একইসঙ্গে কালের অতীত। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ কাব্যে প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব ছিল না। বলা যায় সেইদিক থেকে ছিন্নপত্রের মধ্যে সেই ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক অনুভবের পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে। মৈত্রেয়ী দেবী বলেছেন, "পদ্মাতীরের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ তাঁর চিঠিপত্রের আছে। নানা জনের কাছে ঐ সময়ে তিনি নানা প্রসঙ্গে চিঠি লিখেছেন, তার মধ্যে 'ছিন্নপত্রে' আমরা সেই পদ্মাতীরের সীমাহীন সৌন্দর্যের আলোকসুধা পান করে কবির অন্তরের গভীর অনুভবের সঙ্গে আজও যুক্ত হই। ১ম আট খানি ছাড়া 'ছিন্নপত্রের' আর সমস্ত চিঠিই ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা। এই চিঠিগুলির রচনাকাল আট-নয় বৎসরব্যাপী। কবির বয়স তখন পঁচিশ থেকে তেত্রিশের মধ্যে এবং ইন্দিরা দেবীর বারো থেকে যথাক্রমে তদুর্ধে। উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে থেকে শহরবাসিনীকে লেখা এই চিঠিগুলির মধ্যে কবির নিগূঢ় স্বরূপ যেমন অভিব্যক্ত, তেমনি বোধ হয় আর কোথাও হয়নি।"

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সতেরো-আঠারো তখন ইংলণ্ডের জীবনযাত্রার ছবি তুলে ধরেন তাঁর প্রথম পত্র-সাহিত্য 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'-তে। এই গ্রন্থই কবির প্রথম পত্রসংকলন গ্রন্থ। 'ছিন্নপত্রে' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পত্রাবলী'-তে আমরা যে ভাবাবেগের সহজ অজস্রতা ও লিপি-চাতুর্যের সুসংগত পরিপাটিতা বা শৃঙ্খলা দেখি, 'রাশিয়ার চিঠি'-তে তার বদলে যায়। সেখানে একটা সুস্পষ্টতা, একটা প্রজ্ঞাশীল বিশ্লেষণমুখিতা কবিকে পরিপ্লুত করে। এইদিক থেকে ছিন্নপত্র বিশেষভাবে আত্মকেন্দ্রিক—সেখানে দ্রষ্টা বা বোদ্ধারূপে কবি দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর উপলব্ধিকে রূপ দেননি, তিনি নিজেকে তাঁর প্রতিপাদ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নিয়েই দেখেছেন। কাজেই বাইরেটার উপর যেমন এসে পড়েছে তাঁর আলো তেমনি তাঁর উপরেও এসে পড়েছে বাইরের আলো। সেইদিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, ছিন্নপত্র হল কবির মনন ও দর্শনের একটি অভিজ্ঞান। তাই ছিন্নপত্র পাঠ না করলে সাহিত্যপাঠকের দৃষ্টিতে অর্ধেক রবীন্দ্রনাথ বাদ পড়ে যাওয়ার সম্ভবনা তৈরি হয়। সুতরাং সম্পূর্ণরূপে ও অভেদাত্মারূপে কবিকে বুঝতেই আমাদের এই অভিযান।

৩০২.৪.১৩.২ ছিন্নপত্র ও সমসাময়িক রবীন্দ্ররচনা

১৮৮৫-১৮৯৫ সময়পর্ব :

১৮৮৭ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রগুলি 'ছিন্নপত্রে' সংকলিত হয়েছে। 'ছিন্নপত্রে' মোট ১৫৩ টি পত্র আছে। তার মধ্যে প্রথম আটটি চিঠি কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা। বাকি ১৪৫ টি ইন্দিরা দেবীকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থান থেকে লেখা হয়। এই 'ছিন্নপত্র' গন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালের ২৮ জুলাই। তারও পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ইন্দিরা দেবীকে লিখিত ১০৭ টি চিঠি এবং ছিন্নপত্রের ১৪৫ টি যুক্ত করে 'ছিন্নপত্রাবলী' নামে ১৯৬০ সালে প্রকাশ করে। অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য পর্বটি হল ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত। ছিন্নপত্রের প্রথম চিঠি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখছেন ২৪ জুন ১৮৮৬, বন্দোরা সমুদ্রতীর থেকে এবং ৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫, কালীগ্রাম নাগর নদীর ঘাট থেকে। এই সময়পর্বে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও চৈতন্য কীভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে তার জীবন্ত বর্ণনা আছে এই পত্রগুলিতে। কিন্তু যা নেই, অর্থাৎ ছিন্নপত্রের বাইরের মানুষটি বা মহান স্রষ্টা আর কীভাবে নিজেকে মেলে ধরছেন আমাদের সামনে তার বর্ণনা ব্যতীত এ আলোচনা অসম্ভব।

কবির জীবনে ১৮৮৩ সালে দার্জিলিঙ থেকে ফিরে ছুটিতে থাকা মেজদাদার সঙ্গে বসবাস করছিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ করোয়ার থেকে ফিরে কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথের বাইশ বছর সাত মাস বয়সে বিয়ে হয় বর্তমান বাংলাদেশের যশোরের কন্যা মৃণালিনীর সঙ্গে। তখন তিনি চৌরঙ্গীর কাছাকাছি একটি বাগান বাড়িতে জ্যোতিদাদার সঙ্গেই থাকতেন। এই সময়ে বাড়ির জানালা দিয়ে লোকালয়ের দৃশ্য তাঁর কাছে ছিল ছবির মতো স্বপ্নের মতো। সেই কালের কথাগুলির প্রকাশ আছে 'ছবি ও গান' (১৮৮৪ খ্রি.) নামক কাব্যে। ১৮৮৪ সালে 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতা রচনা শুরু করেন। এই সময়ে জীবনটা একভাবে বেশ চলছিল; কিন্তু হঠাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু এবং সেই সঙ্গে হেমেন্দ্রনাথের (৪০ বছর বয়সে) মৃত্যু মাতৃহারা কবিকে স্তম্ভিত করে দেয়। বিশেষকরে মাতৃরূপী নতুন বৌঠানের চলে যাওয়া, কবির কাছে সাময়িকভাবে অসীম শূন্যতার মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার সমান। ধীরে ধীরে মৃত্যুশোক কাটিয়ে১৮৮৫ সালে রবীন্দ্রনাথ হাজারিবাগ যাচ্ছেন সঙ্গে ইন্দিরা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথ।

১৮৮৬ সাল 'কড়ি ও কোমলের' যুগ। কবির বয়স তখন চব্বিশ বছর, তরতাজা যুবক। স্বপ্ন, প্রেম, প্রকৃতি, নারী, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি সমস্ত দিক থেকেই তরুণ কবির মধ্যে জোয়ার চলছে। কবির মন্তব্য এখানে স্মরণীয়, 'যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কড়ি ও কোমল আমার সেই নবযৌবনের রচনা। আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম।' তিনি আরও বলেছেন, 'এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টি প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথাই বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বরাবর প্রবাহিত হয়েছে।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,'

এই প্রথম পরিপূর্ণ এক কবিকে দেখতে আমরা দেখতে পেলাম। এর পরে 'মানসীর যুগ'। তিনি সপরিবারে কিছুদিন গাজিপুরে বসবাস করেন। জোড়াসাঁকোর ক্ষুদ্র পরিসরের বাইরে স্ত্রীর সঙ্গে পরিপূর্ণ যৌবনের অধিকারী কবির একান্তে আলাপ রবীন্দ্রজীবনে ও সাহিত্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জীবনের এই নতুন অভিজ্ঞতায় সৃষ্টির বিচিত্র রহস্যকে উপভোগ করার নবপ্রেরণা লাভ করলেন।পঞ্চাশের ঘরে পৌঁছে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থটি রচনা করলেও প্রথম জীবনের পঁচিশ বছরে কথা সংক্ষেপে বর্ণনা দিয়েই তিনি সরে গেছেন। 'কড়ি ও কোমল'-এর কবি কাব্যে নিজেকে সেভাবে মেলে ধরেননি; কিন্তু সেইসময়ের কথা ছিন্নপত্র দিতে পারে। তার গহন মনের সন্ধান মিলতে পারে পত্র থেকে পত্রান্তরে। অর্থাৎ পঁচিশ বছর থেকে প্রায় চল্লিশ বছরের অন্তরঙ্গ কবিজীবনের কথাগুলি ছিন্নপত্রে স্থান পেয়েছে।

পাশাপাশি জীবনের গভীর উপলব্ধির জগৎ সম্পর্কে কবিমনের বিশেষ প্রবণতাগুলিই উপেক্ষিত থাকেনি। 'রাজর্ষি' উপন্যাস, 'সমালোচনা'(গদ্যগ্রন্থ), 'মায়ার খেলা' (গীতিনাট্য), 'রাজা ও রাণী' (নাটক), 'বিসর্জন' (নাটক), 'মানসী' (কাব্য), 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী' (২টি খণ্ড), 'চিত্রাঙ্গদা' (নাট্য), 'সোনার তরী' (কাব্য), 'বিদায় অভিশাপ' (নাটক), 'বিচিত্র গল্প' প্রভৃতি এই পর্বে রচিত। জীবনে এতদিন চলছিল একভাবেএখানে ওখানে ঘুরে বেরিয়ে গান গেয়ে কবিতা ও কিছু পত্রপত্রিকায় কিছু কিছু রচনা করে। এবার মহর্ষি কবিকে দায়িত্ব দিলেন জমিদারির মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে সুন্দরাভবে পরিদর্শন ও পরিচালনার।

কবি গেলেন উত্তরবঙ্গ ও শিলাইদহের জমিদারির তদারক করতে। ১৮৮৯ সালে ২৫ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ, মৃণালিনী দেবী, বেলা ও পুত্র রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে পিতার আদেশে শিলাইদহে যান। পদ্মার বিস্তৃত বক্ষে ভ্রমণ করতে করতে প্রকৃতির সঙ্গে ও গ্রাম্যপরিমণ্ডলের সঙ্গে দূরদর্শী কর্মকুশল ও বিচক্ষণ কবির অন্তরঙ্গ যোগসূত্র তৈরি হয়। পল্লীর মানুষকেও তিনি এই সূত্রে গেঁথে ফেললেন তাঁর সৃষ্টিজগতের সঙ্গে। এই সময়ের বিস্তৃত অভিজ্ঞতার কথা ছিন্নপত্রের ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত। স্মরণ করা যেতে পারে, জমিদারির কাজে সাহাজাদপুরে অবস্থানকালে কবি 'বিসর্জন' নাটক রচনা করেন এবং প্রকাশিত হয় ১৮৯০ সালে। এই বছরে মাসখানেক বিলাতের যাত্রার শেষে ডিসেম্বরে 'মানসী' কাব্য প্রকাশিত।

জমিদারির কাজে শুধু উত্তরবঙ্গ নয়; উড়িষ্যা পর্যন্ত কবিকে যেতে হয়। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রান্ত হওয়ার চলমান ভ্রমণের কথা উল্লিখিত আছে ছিন্নপত্রের পত্রে পত্রে। একদিকে ব্যক্তিগত কিছু কথা; অর্থাৎ অন্তঃপ্রকৃতি অন্যদিকে বহিঃপ্রকৃতির—এই দুয়ের সম্মিলনে গড়ে উঠেছে ছিন্নপত্রের পূর্ণঅবয়ব।

৩০২.৪.১৩.৩ ছিন্নপত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আনুমানিক সাত হাজারেরও বেশি চিঠিপত্র রবীন্দ্রনাথের নামে পাওয়া যায়—যা তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে প্রদান করেছিলেন। ছিন্নপত্র তাদের একটি অন্যতম স্মৃতিবিজড়িত মাধ্যম। ছিন্নপত্র সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে গ্রন্থপরিচয় অংশটি দেখে নেওয়া যেতে পারে। সেখানে উল্লিখিত আছে, '১৮৮৭ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতি ইন্দিরাদেবীকে যে-সকল চিঠি লিখিয়াছেন ছিন্নপত্র গ্রন্থখানি প্রধানতঃ

তাহারই সংকলন, কেবল প্রথম আটখানি চিঠি শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা। এই সময়ে লিখিত যাবতীয় চিঠি ইন্দিরা দবী দুটি খাতায় স্বহস্তে নকল করিয়া রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়াছিলেন। এই খাতা দু'টি অবলম্বনে ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'ছিন্নপত্র' প্রকাশিত হয়।' রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে দেওয়া চিঠির বহু অংশ বাদ দিয়ে, প্রয়োজনমতো সংযোজন করে সর্বসাধারণের পাঠযোগ্য করে তুলেছিলেন এখানে। সেই কারণে এই অংশটি 'ছিন্নপত্র' নামে সংকলিত হয়। ব্যক্তিগত কথাবার্তা, পারিবারিক নানান কথা, নানান আলাপ আলোচনা সেখানে মূলত বাদ পড়ে।কবির বাদ দেওয়া চিঠিগুলিকে পুনরায় একত্রিত করে পরবর্তীকালে ১৯৬০ সালের অক্টোবরে 'ছিন্নপত্রাবলী' নামে পূর্ণতর চিঠির সংকলন প্রকাশিত হয়। ছিন্নপত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথকে পারিবারিক ও ব্যক্তগত দিক থেকে আরও অন্তরঙ্গরূপে আমরা পেয়ে থাকি। তবে সেখানে পাঠকমহলে ছিন্নপত্রের সমাদরই তুলনায় বেশি। ছিন্নপত্র গ্রন্থে ১৫৩টি চিঠির সংকলন। তার মধ্যে ১৪টি ১৮৮৫ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে রচিত। অর্থাৎ ছয় বছরে ১৪টি মাত্র লিখিত। নিতান্তই বিক্ষিপ্ত, কবির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু অবশিষ্ট ১৩৮টি পত্র ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে (কবির বয়স তখন ৩০-৩৪, পরিণত প্রতিভার পর্ব) অর্থাৎ ৫ বছরে লিখিত। হিসাব মতো মাসে ২টির কিছু বেশী করে; কাজেই পত্রাঙ্ক অনুসরণ করলে লেখকের অন্তঃপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

এই চিঠিগুলি পড়তে গিয়ে কীট্সের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। 'দু'জনেরই চিঠিতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনন্ত জীজ্ঞাসা; মানবসংসারের প্রতি সুগভীর ঔৎসুক্য, প্রকৃতির প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ, শিল্পকলার প্রতি প্রেমিকের দৃষ্টি...। কীট্সের কবিতার থেকেও চিঠিপত্রগুলি অধিকতর পরিণত।' রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পত্রাবলী' ১৯১৭ থেকে ১৯২৪ খ্রিঃ, কবির বয়স তখন ছাপান্ন-তেষট্টির কোঠায়। আর 'পথে ও পথের প্রান্তে' ১৯২৬ সাল থেকে১৯৩৮ ছড়ানো। কবির বয়স ৬৫-৭২ বছর। 'পথে ও পথের প্রান্তে' ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন তৃতীয়বার ইউরোপে যাত্রা করেন, সে সময় শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবীশ এবং তাঁর পত্নী কবির সঙ্গে ছিলেন—কবি ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরলেন, কিন্তু মহলানবীশরা ইউরোপেই থেকে গেলেন। ফেরার সময় কবি পত্রযোগে তাঁদের সঙ্গে যে আদান-প্রদান করেছিলেন, তা প্রধানত পথে বলেই নাম হয় 'পথে ও পথের প্রান্তে'। অর্থাৎ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পত্রাবলী' শ্রীমতি রাণু অধিকারীকে, 'ছিন্নপত্র'-এর পত্রগুলি সমস্তই লেখা হয়েছিল শ্রীশ মজুমদারকে ও কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা দেবীকে। এগুলি ছাড়া আরও দুটি বই পত্র নামে প্রচলিত—'রাশিয়ার চিঠি' ও 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'। 'রাশিয়ার চিঠি', চিঠির ছদ্মবেশে প্রবন্ধমাত্র; পত্রসাহিত্যের গুণ সেখানে নেই। আর 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' যদিও সে গুণ রাশিয়ার চিঠির থেকে অধিক, তবুও তাকে পত্র না বলে প্রবন্ধজাতীয় কোনো রচনা বলে মনে করা উচিত।

৩০২.৪.১৩.৪ ছিন্নপত্রে বিধৃত বিষয়বৈচিত্র্য

প্রথম বয়সের চিঠির সঙ্গে মধ্যবয়সের এবং মধ্য বয়সের সঙ্গে শেষ বয়সের চিঠির পাথর্ক্যগুলি বিশেষভাবে নজরে পড়ে। যেহেতু বড়ো প্রবন্ধ লিখতে তাঁর মন সবসময় সম্মতি দিত না; তাই তিনি

পত্রাকারে অনেক গ্রন্থ ও বিষয়ের মতামত ব্যক্ত করতেন। ছিন্নপত্রের ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। পত্র মানেই শুধু খবর দেওয়া নেওয়া নয়; তার পাশাপাশি চৈতন্যলোকের বার্তা পাওয়া যায় রবীন্দ্রানাথের এই ধরনের রচনা থেকে। যেখানে সাহিত্যবিষয়ক আলোচনায় পরিপূর্ণ সেখানে সেই আলোচনা গুরুগম্ভীর ও যথার্থ হয়েছে, যেখানে ছোটো ছোটো দৃশ্যে বহিঃপ্রকৃতির কথা বলেছেন, সেখানে প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ মেলে। আবার যেখানে কোনো সংবাদ দেওয়া বা নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে সেখানে পত্রগুলি হয়ে উঠেছে বার্তাবাহক মেঘদূতসম। ধর্ম, দর্শন, মৃত্যু-চিন্তা, শোক, সান্ত্বনা প্রভৃতি—এই সমস্ত বিষয় তাঁর পত্রসম্ভারকে মুখরিত করে তুলেছে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে। কবিমানসের বিভিন্ন বয়সের সরসতা, কৌতুকবোধ, অনন্দানুভূতির প্রাখর্য, পত্রসাহিত্যে নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকেছে বাদ পড়েনি বা উপেক্ষিত থাকেনি কোনো কিছুই।

রবীন্দ্রনাথ লিখিত চিঠিপত্রের ভাণ্ডার বিপুল ও তার পরিসর বিস্তৃত।রবীন্দ্রনাথ 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১ম সং, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫) গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন—'পৃথিবী আপনাকে প্রকাশ করে দ'রকমের চলন দিয়ে। একটা চলন তার নিজেকে ঘিরে ঘিরে—আর একটা চলন বড়ো যাত্রাপথে, সূর্যের চারদিকে।...পৃথিবীর এই দুই শ্রেণীর প্রদক্ষিণের সঙ্গে তুলনা করা চলে সর্বজনের দরবারে সাধারণ সাহিত্যের আর অন্তরঙ্গ মহলে চিঠির সাহিত্যের গতিবিধির। সাধারণ সাহিত্যকে টানে বিরাট পাঠককেন্দ্র, চালায় দূর দেশ দূরকালের পথে ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে। আর চঠির সাহিত্য ধরা দেয় লেখকের কাছঘেঁষা জগতের দৈনিক ছায়া প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনি প্রতিধ্বনি, তার ক্ষণিক হাওয়ার মর্জি আর তার সঙ্গে প্রধানত মিলিয়ে থাকে সদ্যপ্রত্যক্ষ সংসার পথের চলতি ঘটনা নিয়ে আলাপ প্রতিলাপ।'ছিন্নপত্র রচনার সময় কবিমন পথে প্রান্তরে নদীতীরে নদীবক্ষে বোটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

'পথে ও পথের প্রান্তে'-তে কবি বলেছেন, 'তখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বাংলার পল্লীতে পল্লীতে, আমার পথচলা মনে সেই সকল গ্রাম-দৃশ্যের নানা নতুন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছিল; তখনি তখনি তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে। কথা কওয়ার অভ্যাস যাদের মজ্জাগত, কোথাও কৌতুক কৌতূহলের একটু ধাক্কা পেলেই তাদের মুখ খুলে যায়। ও বকুনি জেগে উঠতে চায় তাকে টেঁকসই পণ্যের প্যাকেটে সাহিত্যের বড়ো হাটে চালান করবার উদ্যোগ করলে তার স্বাদ বদল হয়। চার-দিকের বিশ্বের সঙ্গে নানা কিছু নিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় আমাদের মোকাবিলা চলছেই, লাউড স্পীকারে চড়িয়ে তাকে ব্রডকাস্ট করা সয় না।' এই সূত্রে বলা যায়, ছিন্নপত্রের বিষয় হিসেবে এসেছে সাহিত্য, সমাজ, প্রকৃতিপ্রেম, দর্শন, সাহিত্যচিন্তা, আত্মকথা প্রভৃতি। তবে সর্বতোভাবে ব্যক্তিগত বোধের কথা আর গোপন থাকেনি। আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে এই পত্রালোচনার মাধ্যমে। মৈত্রেয়ী দেবী বলেছেন, ছিন্নপত্রের মধ্যে তিনটি বিশেষ ধারা আমারা পাই, "একটি বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া ছবি, আর একটি বাংলাদেশের সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতি। তৃতীয় এই দুই-এর সংগমে উদ্ভুত কবির মনন ও তত্ত্ববাণী..."

রবীন্দ্রচিন্তাসৌধের বহুবিধ উপকরণ তাঁর এই ছিন্নপত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কবির মানসলোকের সন্ধান পেতে হলে তাই ছিন্নপত্রের দ্বারস্থ হতে হয় আমাদের। এখানে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও চিন্তাচেতনার অভিনবত্ব সমগ্র বাংলাসাহিত্যে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মানুষ ও প্রকৃতিভাবনার কথা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কবি

কাব্যভাষার ব্যবহার করছেন। এমনকি মীরার জন্মের সময় কবি শিলাইদহে ছিলেন; কিন্তু নবজাতকের অভিমানকে মনে রেখেই ইন্দিরাদেবীকে পত্রে সেই ব্যক্তিগত অনুভবের কথাও লিখছেন। তাহলে ব্যক্তিগত ভাবনা, যার অনেক অংশ পরে বাদ দেওয়া হয়েছিল ছিন্নপত্রে, পারিবারিক দিক, ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, গ্রামকে সামনে থেকে দেখবার আনন্দানুভূতি এই সমস্তকিছুও এখানে স্থান করে নিয়েছে। ক্ষুদ্রতম বিষয় কবির হাতে কীভাবে মহৎ হয়ে ওঠে তার একমাত্র প্রমাণ এই ছিন্নপত্র। এখানে একটি পত্রে তিনি বলছেন, 'বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই মানুষ বড়ো।' প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে বিশ্বপিতার সৃষ্টিরহস্যকে কবিচিত্ত সর্বোতভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম দার্শনিক মহান হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

৪.১৩.৫ উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের নাম দেন 'ছিন্নপত্র'। জমিদারীর দায়িত্বে কর্মরত রবীন্দ্রনাথের নদীতীরবর্তী ব্যস্তময় জীবন ও বাংলাদেশের প্রকৃতরূপ দেখে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তা আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন ছত্রে ছত্রে। মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে এমন নিকট আত্মীয়তা কবির জীবনে আর সেভাবে কখনও হয়ে ওঠেনি। কত বিচিত্র ছবি, কত বিচিত্র পল্লীপ্রকৃতি ও তার মানুষজন, কত বিচিত্র ও গভীর মনন ও দর্শনের কথা এখানে উঠে এসেছেসেকথা বলাই বাহুল্য! পল্লীবাংলার একটি অতি সাধারণ দৃশ্যও কবির স্পর্শে সোনার ফসল হয়ে উঠেছে পত্র থেকে পত্রান্তরে সে ক্তহা আছে। কবির জীবনের বা কবির মানসিক জগতের কথা বুঝতে হলে এই পত্রগুলির আশ্রয় সবথেকে প্রাসঙ্গিক। এই পত্রগুলিতে কবি এমনভাবে নিজেকে উন্মেলিত করেছেন সাহিত্যের অন্যান্য স্থানে ততখানি নয়। সুতরাং একথা নির্দ্ধিধায় বা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় বাংলা সাহিত্যে সর্বকালের প্রথমশ্রেণির পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথের কথা জানা যায় শেষ বয়সে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত একটি পত্রে (জাভা-যাত্রীর পত্র, পত্রসংখ্যা-চার, পৃ ২২) '...আমার চিঠি লেখবার বয়স পেরিয়ে গেছে। প্রতিদিনের স্রোতের থেকে প্রতিদিনের ভেসে-আসা কথা ছেঁকে তোলবার শক্তি এখন আমার নেই। চলতে চলতে চারদিকের পরিচয় দিয়ে যাওয়া এখন আমার দ্বারা আর সহজে হয় না। অথচ, এক সময়ে এ শক্তি আমার ছিল। তখন অনেককে অনেক চিঠিই লিখেছি। সেই চিঠিগুলি ছিল চলতি কালের সিনেমা-ছবি। তখন ছিল মনের পটটা বাইরের সমস্ত আলোছায়ার দিকে মেলে দেওয়া। সেই-সব ছাপের ধারায় চলত চিঠি। এখন বুঝি-বা বাইরের ছবির ফোটোগ্রাফটা বন্ধ হয়ে গিয়ে মনের ধ্বনির ফোটোগ্রাফটাই সজাগ হয়ে উঠেছে। এখন হয়তো দেখি কম, শুনি বেশি।'

রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পর্বে পেনেটির বাগানে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হলেও সেখানে পরিসীমা ছিল ক্ষুদ্র গণ্ডীর তারে বাঁধা। এই পর্বে কবিচিত্ত প্রসারিত হল, উন্মুক্ত হল প্রকৃতির চিরপরিচিত দ্বারে। তরুণহৃদয়ের এই উপলব্ধির ক্ষেত্রটি পরবর্তী বাংলাসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল বেশি করে। প্রকৃতির সঙ্গে কবির এই আত্মিক সম্পর্কের রসায়নটি গভীর ভালোবাসায় পর্যবসিত হল। প্রকৃতিদর্শনের অভিব্যক্তির কথা আমরা নানান সূত্রে জানতে পারি। সেখানে প্রকৃতি মানুষকে দেখছেন দূর থেকে। তবে ছিন্নপত্রের সময়ে প্রকৃতির কাছে গিয়ে

দেখা—এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা ! সেখানে বৃষ্টি পরার ছন্দ, মানুষের দিনযাপনের ছন্দ, প্রকৃতির নব-নবরূপে সেজে ওঠার সেই চেনাছন্দকে রবীন্দ্রনাথ আর উপেক্ষিত বিষয় হিসেবে সরিয়ে রাখতে পারছেন না। লিখতেই হচ্ছে, প্রকাশ করতেই হচ্ছেকারণ প্রকাশেই আনন্দ। প্রকৃতিও সেই উপলব্ধির কথা নিরন্তর ব্যক্ত করে চলেছে।

৩০২.৪.১৩.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

ক) ছিন্নপত্রে কবিকে আমরা কীভাবে পেতে পারি ? অর্থাৎ ছিন্নপত্রের মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথের কোন রূপে কথা উন্মোচিত হয়েছে ?

খ) রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র সমগ্র বাংলা সাহিত্যে কীভাবে একটু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হয়ে উঠেছে ?

গ) ছিন্নপত্রের সমসাময়িক রচনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩০২.৪.১৩.৭ সহায়ক গ্রন্থ

অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ- নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

রবীন্দ্র-সাহিত্য- বিচিত্রা- শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

কবি সার্বভৌম- মৈত্রেয়ী দেবী

———————

একক-১৪

পত্রসাহিত্যের গুরুত্ব

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৪.১৪.১ ভূমিকা

৩০২.৪.১৪.২ পত্রসাহিত্যের গুরুত্ব

৩০২.৪.১৪.৩ বাংলাদেশের সৌন্দর্যময় প্রকৃতি ও গ্রাম-দর্শন

৩০২.৪.১৪.৪ উপসংহার

৩০২.৪.১৪.৫ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩০২.৪.১৪.৬ সহায়ক গ্রন্থ

৩০২.৪.১৪.১ ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদারির কাজে দিনের পর দিন বাড়ির বাইরে কলকাতার বাইরে পরিবার ও আপনজনদের থেকে দূরে এমনকি স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে দূরে আছেন; সেই সময়ের অনুভবের ও অভিজ্ঞতার কথা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। দায় দায়িত্বের সমস্ত কিছু সুন্দরভাবে মিটিয়ে আবসর সময়যাপনের ফল হল ছিন্নপত্র। সাহিত্যে যে কথা বলা গেল না চিঠিতে এই কথাগুলি না বললেই নয়; তাই পাতার পর পাতা তিনি লিখে গেছেন। পারিপার্শকি সৌন্দর্য উপভোগের আয়োজন ছিল, মনের মধ্যে সেই সৌন্দর্য উপভোগ করবার সতেজ মন ছিল এবং বৃহতের প্রতি যে কী নিবিড় টান ছিল তার প্রমাণ এই পত্রগুলি।

বাস্তবিক এই চিঠিগুলিতে কবিহৃদয়ের অন্তরতম মূল্যবান কথাগুলি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। নিজের গভীর অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা এইভাবে তিনি আর কোথাও বলেননি। আমরা জানি আমাদের জীবনে নির্জনতা বিশেষ করে এক শিক্ষায় শিক্ষিত করে যায়। নিরালা ও নির্জনতা আমাদের শুধু দুর্বলতা নয়; আমাদের কাজের হাতিয়ার-এ কথা রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিখিয়েছেন। পরিবার পরিজন শহর নগর মহানগর থেকে বহু দূরে অবস্থান করেও সকলের কাছে সকলের পাশে ও সকলের সঙ্গে কীভাবে

থাকতে হয়—তা আমরা তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। তিনি উল্লেখ করেছেন, 'নির্জনে আমাদের সমস্ত গোপন অংশ, গভীর অংশ বাহির হয়ে আসে...।' মৈত্রেয়ী দেবী বলেছেন, পদ্মাতীরের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ তাঁর চিঠিপত্রের আছে। সেই পদ্মাতীরের সীমাহীন সৌন্দর্যের আলোকসুধা ও কবির অন্তরের গভীর অনুভবের সঙ্গে আমরাও সংযুক্ত হয়ে যাতে পারি।

৩০২.৪.১৪.২ পত্রসাহিত্যের গুরুত্ব

রবীন্দ্রনাথ বেশিরভাগ সময় পিতৃদেবের মতো গৃহকর্মের থেকে পরিবারের থেকে কলকাতার থেকে দূরে দূরে থেকেছেন। দীর্ঘদিন বাইরে থাকবার কারণে চিঠির মাধ্যমেই পরিজন ও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়েছে। যদিও সারা জীবনে তিনি অসংখ্য (প্রায় চার হাজারের বেশি) চিঠি লিখেছেন। আমাদের কপাল ভালো যে তখন দূরের কোনো মানুষের সঙ্গে কথোপকথনের একমাত্র মাধ্যম ছিল এই পত্রালাপ। টেলিফোন সেভাবে তখন ব্যবহৃত হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ পরিবারের কেউ কিংবাবাইরের, কোনো প্রাজ্ঞজন বা পণ্ডিত, বয়সে ছোট বা বয়সে বড়ো প্রমুখ সকলের সঙ্গে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বা কখনো হাস্যচপল ভঙ্গিতে এই পত্রগুলি লিখেছেন। নানান বিষয় নানান ভাবনার সম্ভার নিয়ে গঠিত কবির এই পত্রসাহিত্য তাই সমকালের ও বর্তমানকালের কাছে এক উজ্জ্বল দলিলস্বরূপ।

চিঠিতে সুনির্দিষ্ট একটি অবস্থান থেকে দেখা নামক ক্রিয়াটি পরিপূর্ণরূপে সম্পন্ন করা হয়। আর রবীন্দ্রনাথ সেই কাজটিই করেছেন। প্রকৃতি মানুষ প্রভৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাব ছিন্নপত্রের আগে সেভাবে দেখা যায়নি। বিশেষত প্রধান ধারা বা মূল ধারার সাহিত্য যখন লিখিত হয়, স্বভাবধর্মেই তা লেখকের ব্যক্তিসীমা থেকে অনেকটা দূরে এসে পড়ে। তাতে লেখকের যে ছোঁয়াটুকু আমরা পাই,তা হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্বের ভাবরূপ। কাজেই নিজের সত্ত্বা সেখানে গোপন থাকে কথকের অন্তর্জালে। কিন্তু চিঠিপত্রে লেখকের মূল লক্ষ্য থাকে কাছের লোকটি, তার ফলে ব্যক্তিগত অনুভবের স্থানটি স্পষ্টরূপ পায়।

পত্র-সাহিত্যে নিজেকে বিশ্লেষণ করার ও নিজের দিকে তাকানোর সুযোগ থাকে। মানুষ লেখকটিকে সেই ক্ষেত্রে সহজেই চিনে নিতে পারি। সুতরাং স্রষ্টাকে জানতে পত্র-সাহিত্য অনেকাংশে মূল সাহিত্যের পরিপূরক হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন জীবনের অনুভবের দিকটি পত্রসাহিত্যে স্পষ্ট হয়। ব্যবহারিক জীবনের কথা অর্থাৎ আত্মীয়তা সৌজন্য এই সব ভাবের প্রকাশ এখানে হয়। কবি এই সমস্ত পত্রে নিজের জীবনের ও সাহিত্যের টীকা করে গিয়েছেন। 'পথে ও পথের প্রান্তে'র ৫ নং চিঠিতে বলেছেন, "চিঠির প্রধান কাজ হচ্ছে সেই গাঁথন সূত্রটিকে যথাসম্ভব অবিচ্ছিন্ন করে রাখা। আমি যে বেঁচে আছি সেটা হল একটা সাধারণ তথ্য কিন্তু সেই আমার থাকার সঙ্গে আমার চারিদিকের বিচিত্র যোগ-বিয়োগের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারাই আমি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষগোচর। এইজন্যেই চিঠিতে খবর দিতে হয়...।"

পত্রে মানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা ও ছবি ফুটে উঠেছে। ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে পরিণত হয়ে উঠেছেন তার আভাস পাওয়া সম্ভব তাঁর পত্রসাহিত্যে। গবেষণা করে দেখলে পাওয়া যাবে তুলনামূলক মানুষ রবীন্দ্রনাথকে। সাহিত্যে যিনি আছেন তিনি কথকের আড়ালে আবডালে কথিত অকথিত মূর্তিতে

বিরাজমান; কিন্তু পত্রসাহিত্য সেই আড়াল ঘুচিয়ে দিয়ে প্রত্যক্ষতার দ্বারা উপস্থিত করে। 'পত্রধারা'র (প্রভাতকুমার মুখোপাধায় দ্বারা মুদ্রিত, ১ম সং ১৩৪৫) ভূমিকায় কবি বলেছেন, "সাধারণ সাহিত্যকে টানে বিরাট পাঠককেন্দ্র, চালায় দূর দেশ দূরকালের পথে ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে। আর চিঠির সাহিত্যে ধরা দেয় লেখকের কাছঘেঁষা জগতের দৈনিক ছায়া প্রতিচ্ছায়া,ধ্বনি প্রতিধ্বনি,তার ক্ষণিক হাওয়ার মর্জি আর তার সঙ্গে প্রধানত মিলিয়ে থাকে সদ্যপ্রত্যক্ষ সংসার পথের চলতি ঘটনা নিয়ে আলাপ প্রতিলাপ।"

পত্রসাহিত্য ক্ষুদ্র ভাবনার সম্ভার। সেখানে ছোটো দুঃখকথা সহজসরল ভঙ্গিতে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। ভানুসিংহ ঠাকুরের পত্রাবলী'র ৪৬ নং পত্রে, পৃ ১২৫, বলেছেন, "চিঠি জিনিসটাই ছোট্ট, মালতী-ফুলের মতো, কিন্তু সেই চিঠি যে-আকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে সেই আকাশ মালতী-লতারই মতো বড়ো।" এই একটিমাত্র স্থান যেখানে রবীন্দ্রনাথকে বহুরূপে ও বহুভাবে পাওয়া সম্ভব।

৩০২.৪.১৪.৩ বাংলাদেশের সৌন্দর্যময় প্রকৃতি ও গ্রাম-দর্শন

রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে নিজের পরিচয় প্রদানে স্বাছন্দ্যবোধ করতেন। প্রকৃতির সঙ্গে এমন অবিচ্ছিন্ন ঐক্যবন্ধন আর কোথাও দেখা যায় না। নদী নালা, উন্মুক্ত প্রান্তর, মুক্ত আকাশ, গ্রামের সরল অধিবাসিবৃন্দ—এই সকলকেই তিনি আপনার জন হসেবেই গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। প্রকৃতির সঙ্গে সুমধুর সম্পর্কের ছবি আমরা যেমন এখানে পেয়ে থাকি; তেমনি সহজ সরল ছন্দের পল্লীবাংলার চিত্রের কথা ও বর্ণনাও পেয়ে যায়। একটি পত্রে (৫২ নং) বলেছেন, 'যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে। কিন্তু, এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে, সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক্, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।' এই উপলব্ধির স্থান থেকে এই পর্বের মানুষ রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের সৌন্দর্যময় আভামিশ্রিত সুন্দর প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে দেখে বর্ণনা দিচ্ছেন। শুধু বর্ণনা নয়; তাকে একান্ত আপনজন ভেবে তার ভেতরের কথাকেও ব্যক্ত করে চলেছেন নিরন্তর। শিলাইদহের শরৎকালের সকাল দেখে কবির সুপ্ত কবিত্ব প্রকাশ হয়ে যায়, যা কলকাতার পরিমণ্ডলে আসে না। গ্রামের সুদর্শনরূপ পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই মনের কোণে জমে থাকা কবিত্ব নামক বিশেষত্বটি মুকুলিত হয়ে ওঠে। ৬৩ নং পত্রে আছে, 'চার দিক থেকে আকাশ আলো বাতাস এবং গান একরকম মিলিতভাবে এসে আমাকে অত্যন্ত লঘু করে আপনাদের সঙ্গে যেন মিশিয়ে ফেলেছে। আমার সমস্ত মনটাকে কে যেন তুলিতে করে তুলে নিয়ে এই রঙিন শরৎপ্রকৃতির উপর আর-এক পোঁচ রঙের মতো মাখিয়ে দিচ্ছে, তাতে করে এই-সমস্ত নীল সবুজ এবং সোনার উপর আর-একটা যেন নেশার রঙ লেগে গেছে...।'

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মাজুমদারকে লেখা একটি পত্রে(পত্র নং ৫) কবি বলেছিলেন, 'বাংলার অন্তর্দেশবাসীদের কথা এখনও পর্যন্ত কেউ বলেননি, যেটুকু বলতে চেয়েছেন বঙ্কিমবাবু সেখানেই পুরাতনের কথা বলতে

গিয়ে বানাতে হয়ে। কিন্তু; 'আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ডকর্মশীল-পৃথিবীর-এক-নিভৃত-প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালির কাহিনী কেউ ভালো করে বলেননি।' পতিসর থেকে ১৮৯১ সালে একটি পত্রে (পত্র নং- ১৬) তিনি বলছেন, 'অনেক দূরে দূরে একটা-একটা ছোটো-ছোটো গ্রাম আসছে। গুটিকতক খোড়ো ঘর, কতকগুলি চাল শূন্য মাটির দেওয়াল, দুটো-একটা খড়ের স্তূপ, কুলগাছ আমগাছ বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়, গোটা-তিনেক ছাগল চরছে, গোটাকতক উলঙ্গ ছেলে মেয়ে; নদী পর্যন্ত একটি গড়ানে কাঁচা ঘাট, সেখানে কেউ কাপড় কাচছে, কেউ নাইছে, কেউ বাসন মাঝছে; কোনো কোনো লজ্জাশীলা বধূ দুই আঙুলে ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করে ধরে কলসী কাঁখে জমিদার বাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে, তার হাঁটুর কাছে আঁচল ধরে একটি...।' শহর ও গ্রামের মধ্যে একটি প্রতিতুলনা করে রবীন্দ্রনাথ গ্রামজীবনকে বা গ্রামদর্শনকে এই পর্বে সম্মুখে আনছেন। পাড়াগাঁয়ের কর্মস্রোত কেমন তার কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন (৯০ নং পত্রে), 'ছোটোখাটো গ্রাম, ভাঙাচোরা ঘাট। টিনের-ছাত-ওয়ালা বাজার, বাঁখারির-বেড়া-দেওয়া গোলাঘর, বাঁশঝাড়, আম কাঁঠাল খেজুর শিমুল কলা আকন্দ ভেরেন্ডা ওল কচু লতাগুল্ম তৃণের সমষ্টিবদ্ধ ঝোপঝাড় জঙ্গল, ঘাটে-বাঁধা মাস্তুল-তোলা বৃহদাকার নৌকার দল, নিমগ্নপ্রায় ধান... পাড়াগাঁয়ের কর্মস্রোত খুব বেশি তীব্রও নয়, অথচ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নির্জীবও নয়। কাজ এবং বিশ্রাম দুই যেন পাশাপাশি মিলিত হয়ে হাত ধরাধরি করে চলেছে।' এই সাজাদপুরে এসে কবি একটি পরিসর পান। নড়বার চড়বার জায়গা পান। ১১৯ নং পত্র। এটিও সাজাদপুর থেকে লেখা। বলেছেন 'বড়ো বড়ো জানলা দরজা, চারি দিক থেকে আলো বাতাস আসছে, যে দিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই গাছের সবুজ ডালপালা চোখে পড়ে এবং পাখির ডাক শুনতে পাই, দক্ষিণের বারান্দায় কেবলমাত্র কামিনীফুলের গন্ধে মস্তিষ্কের সমস্ত বন্ধ্র পূর্ণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ বুঝতে পারি, এতদিন বৃহৎ আকাশের জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষুধা ছিল, সেটা এখানে এসে পেট ভরে পূর্ণ করে নেওয়া গেল।' এখানে তিনি একা একটি বৃহৎ গৃহের মালিক! একলা বসে থাকতে পারেন, সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারে, মনের কথা শুনতে পারেন। ইচ্ছে করলে বাইরে গিয়ে প্রকৃতিকে একবার ক্ষণিকের জন্যে দেখে আসতে পারেনযা ছিল এতকালের কল্পনা ও সাধনা। কবি নিজেও বলেছেন (পত্র-১২২) 'আমি আলো ও বাতাস এত ভালোবাসি !' আশৈশব নগরলালিত মানুষের কাছে একটি নতুন অনুভব।তাই এই পর্বে কাজের ফাঁকে নিজেকে মেলে ধরবার পাকাপোক্ত সুযোগ পান কবি।

নির্জনতার রূপ সন্ধান:

নির্জনতার রূপ কেমন তা আমরা জানি, কিন্তু নির্জনতার মধ্যে কোথায় আনন্দ লুকিয়ে থাকে—সেকথা আমাদের রবীন্দ্রনাথই দেখতে শিখিয়েছেন। ইহজগতে নির্জনতায় যত আনন্দ আছে, দুঃখে যত আনন্দ আছে, সেক্ষেত্রে আনন্দ নামক অনুভূতিটিআর কোথাও সেভাবে নেই। বিশ্বজগতে সৃষ্টির কোনো শেষ নেই; শুধু তাকে খুঁজে পেতে হয়, তাকে দেখতে জানতে হয়, তাকে স্পর্শ করতে শিখতে হয়। পৃথিবীর মধ্যে এমনতর নির্জনতা কবি খুঁজে পেয়েছিলেন জমিদারকর্মে রত বাংলাদেশের এই প্রান্তগুলিতে। ৭৭ নং পত্রে আছে, 'এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে,

নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায় ? ... বৃহৎ সমুদ্রের তীরে কিম্বা মুক্ত আকাশের নীচে একলা না বসলে সেই আপনার অন্তরের গোপন মহারহস্য ঠিক অনুভব করা যায় না।'

প্রকৃতিসংলগ্ন নদী-নালা, উন্মুক্ত অবারিত মাঠ, ঘন সবুজ জঙ্গল, ছোটো ছোটো ঘরবাড়ি, নদীর কোল, ঘাট, উঁচু পাড় এক শহরবাসীর কাছে আশ্চর্য স্বপ্নের মতো মনে হয়। তিনি অনুভব করেন, 'পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই-যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাত্রে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ-সংসারে এ-যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়। সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্ব দিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যার পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে-এক প্রকাণ্ড পাতা উলটে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য লিখন—আর এই ক্ষীণপরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর আর ঐ ছবির মতন পরপারধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ—এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা!'

প্রকৃতির বা জগতের গহন গভীরের রূপ কবি অনুসন্ধান করতে চান। মানবসংসার আসলেই যে একটি রহস্যেঘেরা জগৎ তা তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ঠ হয়ে যায়, '...পৃথিবীতে একটা বৃহৎ কর্মপ্রবাহ চলছে যার অধিকাংশের সঙ্গেই আমার যোগ নেই—পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আমার কেউ নয়, অথচ তাদের কত কাজকর্ম সুখদুঃখ উৎসব-আনন্দ চলছে। কী বৃহৎ পৃথিবী ! কী বিপুল মানবসংসার !' মানুষ যখন বুঝতে পারে সমগ্র বিশ্বের কাছে সে কতখানি ক্ষুদ্র তখন সে আরও কিছুর অনুসন্ধানের ব্রত গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কোলে বসে পাশে বসে একজন হয়ে দেখেছেন।

চরিত্রবৎ প্রকৃতি ও কবি :

ছিন্নপত্রে প্রকৃতি ও মানুষের একসূত্রে বন্ধনের সুদর্শন শিল্পরূপ দেখতে পাওয়া যায়। মানবপ্রীতির প্রতি আকর্ষণের বশেই এই পর্বে কবির হাতে প্রকৃতি চরিত্রবৎ হয়ে ওঠে। দীর্ঘ পরিচয়ে পরিচিত জগৎ থেকে দূরে অবস্থান করে প্রকৃতিকে সম্মুখে রেখে তিনি তার সঙ্গে কথোপকথন সেরে নিতে পারেন অবলীলাক্রমে। সরল প্রকৃতিলালিত এই মানুষটিকে প্রকৃতিও কোলে করে নিল দীর্ঘ আত্মীয়তার সূত্রে। বিশ্বভুবন এক নিমেষে মুখোমুখি বসবার সম্পর্ক গড়ে তুলে এতোদিন দূরে থাকার বেদনা প্রকাশ করলো! কবি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন এতদিনে! এক আভরণ ঘুচে গেলে উপস্থিত হয় অন্য আভরণ। সেই মতো আলতো করে ছুঁয়ে দেখতে পারলেন এই প্রকৃতিকে, খুব কাছ থেকে, সামনে, পাশে থেকে। ২২ নং পত্র উল্লেখ করছেন, 'অনেক দিন পরে আবার এই বড়ো পৃথিবীটার সঙ্গে যেন দেখা-সাক্ষাৎ হল।সেও বললে, 'এই-যে!' আমিও বললুম 'এই-যে!' তারপরে দুজনে পাশাপাশি বসে আছি—আর কোনো কথাবার্তা নেই... সবসুদ্ধ মিলে খুব একটা স্বপ্নাবিষ্ট ভাব।'

সাজাদপুরের অনতিদূরে বোটে যেতে যে প্রকৃতি দেখেছিলেন, তার রূপ—'দু ধারের তটভূমি অবিশ্রাম চোখের উপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে, সমস্ত দিন তাই চেয়ে আছি, কিছুতেই তার থেকে চোখ

ফেরাতে পারছি না... নদী এবং তীর উভয়ের আকার প্রকারের ভেদ ক্রমশই ঘুচে গেছে, দুটি অল্প বয়সের ভাই-বোনের মতো।' (পত্র নং ১৯) সেখানে আরও আছে, '... জলের স্রোত বিদ্যুতের মতো বোটটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দাঁড়িরা লগি হাতে সামলাবার চেষ্টা করছে, পাছে ডাঙার উপর বোটটাকে আছড়ে ফেলে। এ দিকে হু হু করে বাদলার বাতাস দিচ্ছেঘন মেঘ করে রয়েছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে, শীতে সবাই কাঁপছে—ক্রমে ক্রমে খোলা নদীতে এসে পড়লুম... খুব উঁচু পাড়ে—বরাবর দুই ধারে গাছপালা লোকালয়—এমন শান্তিময়, এমন সুন্দর, এমন নিভৃত—দুই ধারে স্নেহ সৌন্দর্য বিতরণ করে নদীটি বেঁকে বেঁকে চলে গেছে আমাদের বাংলাদেশের একটি অতিপরিচিত অন্তঃপুরচারিণী নদী। কেবল স্নেহ এবং কোমলতা এবং মাধুর্যে পরিপূর্ণ। চাঞ্চল্য নেই, অথচ অবসরও নেই। গ্রামের যে মেয়ে ঘাটে জল নিতে আসে, এবং জলের ধারে ব'সে ব'সে যত্নে গামছা দিয়ে আপনার শরীরখানি মেজে তুলতে চায়—তাদের সঙ্গে এর যেন প্রতিদিন মনের কথা এবং ঘরকন্নার গল্প চলে।'

৪২ নং চিঠিতে আছে—'আজ পূর্ণিমার রাত। ঠিক আমার বাঁ দিকের খোলা জানলার উপরেই একটা মস্ত চাঁদ উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে; বোধ হয় দেখছে আমি চিঠিতে তার সম্বন্ধে কোনো নিন্দে করছি কি না। সে হয়তো মনে করে তার জ্যোৎস্নার চেয়ে তার কলঙ্কের কথা নিয়েই পৃথিবীর লোকে বেশি কানাকানি করে।... কাল কাছারি সেরে এই ছোটো নদীটি পার হবার সময় দেখতে পাব, আমার সঙ্গে আমার এই প্রবাসের প্রণয়িনীর একটুখানি বিচ্ছেদ হয়েছে; কাল যে আমার কাছে আপনার রহস্যময় অপার হৃদয় উদঘাটন করে দিয়েছিল আজ তার মনে যেন একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে; যেন তার মনে হচ্ছে, একেবারে এতখানি আত্মপ্রকাশ কি করা ভালো হয়েছিল। তাই হৃদয় আবার একটু একটু করে বন্ধ করছে। বাস্তবিক, বিদেশে বিজন অবস্থায় প্রকৃতি বড়ো কাছাকাছির জিনিস।' প্রকৃতিকে এইভাবে ও এমনভাবে আপন করে নেওয়ার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। তার সর্বাঙ্গে প্রাণের সজীব স্পর্শ মাখিয়ে এত আপন করে নেওয়া বিশেষত এই কবির কাছেই সম্ভব। আর একটি দৃষ্টান্ত না দিলেই নয়—৬৭নং পত্রে শিলাইদহে বোটে বসে বসে দুপুরের দৃশ্য দেখে কবির মনে হয়েছে, 'চারি দিকে একটা স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ মৃদুকলধ্বনি, একটা সুকোমল নীল বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামল রেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্যের একটি নিত্য-উৎসব উদ্ঘাটিত হয়ে যায়, তখন আবার নতুন করে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়। এই পৃথিবীটা আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। ...আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।'

৭৪ নং চিঠিতে কবি উল্লেখ করেছেন, কয়েকদিনের বৃষ্টির পরে ক্ষণিক রৌদ্রতাপে তাঁর মনে হয়, 'মনে করেছিলুম বৃষ্টি বাদলা একরকম ফুরোল, এখন স্নাত পৃথিবীসুন্দরী কিছুদিন রৌদ্রে পিঠ দিয়ে আপনার ভিজে এলোচুল শুকোবে, আপনার সিক্ত সবুজ শাড়িখানি রৌদ্রে গাছের ডালে টাঙিয়ে দেবে, মাঠের মধ্যে মেলে দেবে—বসন্তী আঁচলখানি শুকিয়ে ফুফুরে হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে।' ৭৯ নং পত্রে কবি পদ্মাকে মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করে দেখেছেন এইভাবে—'বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি।

ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মাআমার যথার্থ বাহন—খুব বেশি পোষ-মানানয়, কিছু বুনোরকম; কিন্তু ওর পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে। এখন পদ্মার জল অনেক কমে গেছে—বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছেএকটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপ্‌ছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছে, আর শাড়িটি বেশ গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে। আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো...।'

পল্লীদর্শনের ভিন্নতর রূপও নিম্নবর্ণের কথা :

গ্রাম বলতে শুধু তো প্রকৃতির কথা এসেছে তা নয়; সেখানে গ্রামের নানান ধর্মের নানান জাতি ও বর্ণের মানুষের কথাও উপস্থিত হয়েছে। শিলাইদহে তখন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কর্মকার, সূত্রধর, গোপ, জেলে, তাঁতি প্রভৃতি জাতির মানুষে পরিপূর্ণ ছিল। এই সমস্ত জাতির বাইরে 'বেদে' নামক একটি সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ তিনি পান। 'বেদে'-রা বাংলাদেশের এমন একটি প্রাচীন জনজাতি। তাদের স্বভাব চরিত্র তিনি এবার দেখবার সুযোগ পেলেন। সেই সম্প্রদায়ের মেয়েদের কথা ও তাদের জীবনের কথা, যাপনের কথা এই সূত্রে তিনি এখানে বিস্তৃত আকারে উপস্থাপিত করেছেন, 'বেদে জাতটাই এইরকম। কোথাও বাড়ি ঘর নেই, কোনো জমিদারকে খাজনা দেয় না...।' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ রবীন্দ্রনাথ একটি কথাসূত্রে তারাশঙ্করকে বলেছিলেন 'তোমার মতো গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়িনি। তারপরই হেসে বললেন, তবে এ-কথার শুরু প্রথম আমিই করেছি। আমি যখন বাংলা দেশের গাঁয়ের ঘাটের কথা লিখি তখন বাংলা সাহিত্যে রাজপুতানার রাজত্ব চলেছে। আবার বললেনতুমি দেখছ। আমি তো দেখবার সুযোগ পাইনি। তোমারা আমাকে দেখতে দাওনি। আমাদের তো পতিত করে রেখেছিলে তোমরা... দেখবেদু চোখ ভরে দেখবে। দূরে দাঁড়িয়ে নয়। কাছে গিয়ে পাশে বসে তাদের একজন হয়ে যাবে।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজাদের সন্তানতুল্য মনে করতেন, তাই তাদের দুঃখে কবিমন ছিল ভারাক্রান্ত। ছিন্নপত্রের ৮১ নং পত্রে কবি বলছেন, 'আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে...।' কবি মনে করতেন মানুষে মানুষে যদি সত্যিই কোনো আধ্যাত্মিক যোগ থাকে তাহলে অবশ্যই মানুষের ভালো করা সম্ভব। তিনি সবসময় তাদের ভালো ও মঙ্গল চাইতেন। সেই প্রত্যাশা নিয়েই তাদের কাছে গিয়েছিলেন।

প্রকৃতির অপরূপ শোভা ও রূপকথার গল্পভূমি :

জমিদারি পরিদর্শনের কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগের পর পল্লীসর্বস্ব সমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গে প্রথম আলাপে তিনি অভিভূত হয়ে যান। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পল্লীপ্রকৃতি শুধু একটি নির্জীব থাকেনি;

সজীব হয়ে ওঠে রূপকথার আদলে। প্রকৃতির রূপের সঙ্গে রূপকথার জগতের সম্পর্কসূত্র নির্মাণ করে কবি প্রকৃতি ও রূপকথা দুটিকেই মহিমান্বিত করে তুলেছেন। এই পর্বে তার দৃষ্টান্ত আছে বিস্তর। ২৩ নং পত্রে আছে, 'ক্রমে যখন অন্ধকারে সমস্ত অস্পষ্ট হয়ে এল, কেবল জলের রেখা এবং তটের রেখায় একটা প্রভেদ দেখা যাচ্ছিল, এবং গাছপালা কুটির সমস্ত একাকার হয়ে একটা ঝাপসা জগৎ চোখের সামনে বিস্তৃত হয়ে পড়ে ছিল তখন ঠিক মনে হচ্ছিল এ-সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার অপরূপ জগৎ—যখন এই বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পূর্ণ গঠিত হয়ে ওঠে নি, অল্পদিন হল সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতিবিস্ময়পূর্ণ ছম্-ছম্-নিস্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্নযখন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে মায়াপুরে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, যখন রাজপুত্র এবং পাত্তরের পুত্র তেপান্তরের মাঠে একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে...হঠাৎ মনে হবে, এতক্ষণ একটা গল্প বলছিলুম; এখন গল্প ফুরিয়েছে, এখন অনেক রাত্রি, এখন ছোটো ছেলের ঘুমাবার সময়।'

৫৫ নং পত্রে (গোয়ালন্দের পথে) আছে, বহিঃপ্রকৃতির নানা পরিবর্তমান দৃশ্য দেখে আমাদের মনের মধ্যে জেগে ওঠে সেই রূপকথার দিনের দৃশ্যগুলির চিত্র। প্রকৃতি শুধুই একটি দৃশ্যপট নয়; তাকেও রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন মাত্রা দিয়েছেন। দৃশ্য গন্ধ ধ্বনি আমাদের সামনে শুধু স্বরূপে উপস্থিত হয় তা নয়; তারও নানান গুরুত্ব থেকে যায়। এক ঘণ্টাধ্বনি আমাদের যেমন দশ বছর পূর্বের দেখা বিরলা মন্দিরের কথা মনে করিয়ে দেয়। তেমনি একটি প্রকৃতির শোভা আমাদের সামনে সেই শিশুমনে গ্রথিত রূপকথার জগৎকে মনে করিয়ে দেয়। বিজ্ঞানটি আমরা জানি কিন্তু বর্ণনার দৃশ্যটি এবার দেখা যাক—বরীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'একটা হল্‌দে রকমের তৃণতরুশূন্য বালির চর ধূ ধূ করছে, তারই গায়ে একটা জনশূন্য নৌকা বাঁধা রয়েছে এবং আকাশের ছায়ায় ফিকে নীলবর্ণ নদী বয়ে চলে যাচ্ছে—দেখে মনের ভিতরে কিরকম করে বলতে পারি নে। বোধ হয় সেই ছেলেবেলায় যখন আরব্য-উপন্যাস পড়তুম, সুন্ধ্বাদ নানা নূতন দেশে বাণিজ্য করতে বাহির হত, ভৃত্য-শাসিত তোষাখানার মধ্যে রুদ্ধ হয়ে বসে বসে দুপুর বেলায় সিন্ধ্বাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতুম, তখন যে আকাঙ্ক্ষাটা মনের মধ্যে জন্মেছিল সেটা যেন এখনও বেঁচে আছে—ঐ বালিচরে নৌকা বাঁধা দেখলে সেই যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় যদি আরব্য-উপন্যাস রবিন্‌সন্-ক্রুসো না পড়তুম, রূপকথা ন শুনতুম, তা হলে নিশ্চয় বলতে পারি, ঐ নদীতীর এবং মাঠের প্রান্তের দূরদৃশ্য দেখে ঠিক এমন ভাব মনে উদয় হত না; সমস্ত পৃথিবীর চেহারা আমার পক্ষে আর-একরকম হয়ে যেত। এইটুকু মানুষের মনের ভিতরে বাস্তবিকে কাল্পনিকে জড়িয়ে-মড়িয়ে কে-যে একটা জাল-পাকিয়ে আছে !' বাস্তবিক এই ঘটনা আমাদের সঙ্গে ঘটে থাকলেও কবি যেন এর একটি নাম দিলেন এইভাবে।

সবসময় রূপকথার কথাই এসেছে তা নয়; কখনো কখনো বাল্যস্মৃতিকে উসকে দিয়ে যায় প্রকৃতির অপরূপ শোভা। যেমন ৬৪ নং পত্রে আছে শিলাইদহের প্রকৃতির রূপ দেখে কবির বাল্যকালে পঠিত 'রবিন্‌সন্-ক্রুশো পৌলবর্জিনি' প্রভৃতি বইয়ের কথা মনে পড়ে যায়। বইয়ের পৃষ্ঠায় দেখা গাছপালার চিত্রের সঙ্গে আজকের দেখে চিত্র কী অদ্ভুতভাবে মিলে একাকার হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি এই রকম

জ্যামিতিক হিসেব থেকে গাণিতিক হয়ে ওঠে। জ্যামিতি যেমন একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্নের কথাকেই তুলে ধরে, তেমনি বাল্যকালের চিত্রগুলিও কবির কাছে ছিল কল্পনা। সেই কল্পনা হিসেব করে করে আজ মিলে যায়তাই গাণিতিক হয়ে ওঠে। প্রকৃতির এই রূপতৃষ্ণা উপভোগ তরুণ কবির জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলেই মনে হয়। আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—৭৮ নং পত্রে কবি বলেছেন রাত্রি দশটার সময় ছাদে গিয়ে একলা হাওয়া খেতে খেতে একলা থাকায় মনে পড়ে যায় সমস্ত জীবনের কথাগুলি। সেখানে তাঁর মনে হয়েছে, 'পুরোনো স্মৃতিগুলো মদের মতো; যত বেশিদিন মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে ততই তার বর্ণ এবং স্বাদ এবং নেশা যেন মধুর হয়ে আসে।'

জমিদার ব্যক্তিত্ব:

জমিদারের কর্তব্য মহাপুণ্য কর্ম, প্রজাপালন ও প্রজার উন্নতিসাধন করবার ভার গ্রহণ করেই তিনি মহর্ষিকে স্তম্ভিত করে দেন। শহরে বসবাসকারী যুবক হলেও তিনি সুদূর পল্লীবাংলায় নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন ভালোভাবে ও যথযথভাবেই। প্রজাদের বিক্ষোভ দমনে অন্তরঙ্গ জমিদার রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ধীশক্তি দেখে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়েছিলেন। 'পদাতিক সৈন্য'-দের বাড়াবাড়িতে কবি ভীষণ বিরক্ত ছিলেন। তারা এমন আচরণ করে যেন, 'রাজার চতুর্দিকটা হাসিহীন খেলাহীন শব্দহীন জনহীন ভীষণ মরুভূমি করতে পারলে তাদের মনের মতো রাজসম্ভ্রম রক্ষা হয়।' (পত্র-২৮) কবি এক্ষেত্রে রাজমর্যদা জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের সম্পূর্ণরূপে এই কাজের থেকে বিরত রেখে সাধারণ মানুষের পাশে বসতে পেরেছিলেন। কবি প্রায় সমস্ত পত্রে প্রমাণ করেছেন যে, এই গ্রাম্য মানুষগুলিকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে তাদের মনের কথা অনুভব করেছিলেন। সেই কারণে তাদের জীবন যাত্রার এই খুঁটিনাটি কথা তিনি উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন। যুবক কবি নগরবাসী হয়েও গ্রামের সকলের মন জয় করতে পেরেছিলেন। প্রজাদের সরাসরি দান ও সাহায্য না করে তাদের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সেই কারণে জমিদার হিসেবে তাঁর বেশ সুনাম ছিল।১৩৪৬ সালে 'শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ' ভাষণে তিনি বলেন, ''যতদিন পল্লীগ্রামে ছিলেম ততদিন তাকে তন্নতন্ন করে জানবার চেষ্টা আমার মনেছিল। কাজের উপলক্ষে এক গ্রাম থেকে আর-এক দূর গ্রামে যেতে হয়েছে, শিলাইদা থেকে পতিসর, নদীনালা-বিলের মধ্য দিয়ে—তখন গ্রামের বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি। পল্লীবাসীদের দিনকৃত্য, তাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র চিত্র দেখে প্রাণ ঔৎসুক্যে ভরে উঠত। আমি নগরে পালিত, এসে পড়লুম পল্লীশ্রীর কোলে—মনের আনন্দে কৌতূহল মিটিয়ে দেখতে লাগলুম। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্যে কিছু করব এই অকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছট্‌পট্ করে উঠেছিল... তার পর থেকে চেষ্টা করতুম—কী করলে এদের মনের উদবোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে। আমরা যদি বাইরে থেকে সাহায্য করি তাতে এদের অনিষ্টই হবে...এদের উপকার করা শক্ত, কারণ এরা নিজেকে বড়ো অশ্রদ্ধা করে। তারা বলত, 'আমরা কুকুর, ক'ষে চাবুক মারলে তবে আমরা ঠিক থাকি।"

৩০২.৪.১৪.৪ উপসংহার

ছিন্নপত্রের মতো পত্রগুচ্ছে লেখকের বা রচনাকারের ব্যক্তিগত দর্শনটি খুব ভালোভাবেই উন্মোচিত হয়ে যায়। চিঠির মধ্যে দিয়ে সেই মানুষটির চারপাশের জগতের সামগ্রিক চিত্র ফুটে ওঠে। পত্রলেখক ব্যক্ত করেন গ্রামকে দেখা, গ্রামজীবনের সাধারণ ও অতিসাধারণ ঘরোয়া জীবনকে খুব কাছ থকে দেখবার অভিজ্ঞতা। কর্মজগতে তিনি বিভিন্ন কর্মে সদাব্যস্ত থাকলেও প্রাণের আরাম বোধ করেছেন এই পত্ররচনার মধ্যে দিয়ে। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অনালোকিত অধ্যায়ের পাঠ নিতে হলে পত্রসাহিত্যের কথা স্মরণ করতেই হয়। জ্ঞাত অজ্ঞাত নানান কথার সম্ভার এই পত্রগুলি। শুধুই কি গ্রামজীবনের কথা ! এখানে নদীতীর, নদীতীরবর্তী ঘাটের কথা, বিভিন্ন খাল বিল, ছোটো ছোটো পুষ্করিণী জলাশয়, গাছপালা, স্নিগ্ধ সমীর এই সমস্ত কিছু তাঁর এই পত্রগুলিতে উঠে এসেছে। ৯৪ নং পত্রে আছে একদিন কালীগ্রামে যেতে গিয়ে একটি বিলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নানান পুরোনো কথাও মনে এসে যায়।

প্রকৃতি রবীন্দ্রদৃষ্টিতে এক মায়াময় জগতের কথা মনে করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রমননে এই গ্রামদর্শন তাই এতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিদেবের নির্দেশমতো বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘোরাঘুরি করে পল্লীর কোলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে গিয়ে উপলব্ধি করেন শহরের জীবনের সঙ্গে গ্রামের জীবনের একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। একটি পত্রে (৮৪ নং) তিনি উল্লেখ করেছেন, 'শহরের রাস্তা যেমন ব্যাবসাবাণিজ্য গাড়িঘোড়া চলবার জন্যে ইঁটে-বাঁধানো, কঠিন, তেমনি মনটা স্বাভাবটা বিজ্‌নেস চালাবার উপযোগী পাকা করে বাঁধানো—তাতে একটি কোমল তৃণ, একটি অনাবশ্যক লতা গজাবার ছিদ্রটুকু নেই। ভারী ছাঁটাছোঁটা গড়াপেটা আইনে-বাঁধা মজবুত রকমের ভাব।' পিতা হয়তো চাইতেন জমিদারের উচিত কাজ হল প্রজাদের সঙ্গে থাকা পাশে থাকা। এই কারণে তিনি গ্রামকে খুব কাছ থেকে দেখে নিকট আত্মীয়ের মত সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে আত্মীয়দের চিঠি লিখেছেন সংখ্যায় বহু। তাই যে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত জীবনে, সমগ্র সৃষ্টিতে আমরা পেলাম না; সেই অভিনব আর এক রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই এই ছিন্নপত্রে। কবি চিরকাল নিজের দুঃখ কষ্ট লজ্জা প্রভৃতি মনের বিকারগুলিকে প্রকাশে সদাকুণ্ঠিত ছিলেন। এই একটিমাত্র স্থান যেখানে তিনি অকুণ্ঠচিত্তেআকারে ইঙ্গিতে কখনও বা ব্যঞ্জনায় তাঁর মনের প্রকৃত অবস্থানের কথা প্রকাশ করেছেন। অনেক সময় নানান অপ্রকাশিত কথা অনায়াসে প্রকাশিত হয়ে যায় চিঠিতে। কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীকে একটি পত্রে (চিঠিপত্র- খণ্ড-১, ১৮ নং পত্র, পৃ ৩৪) পত্ররচনার শৈলী সম্পর্কে বলেছিলেন, 'দূরে থাকার একটা প্রধান সুখ হচ্ছে চিঠি—দেখাশোনার সুখের চেয়েও তার একটু বিশেষত্ব আছে। জিনিসটা অল্প বলে তার দামও বেশি দুটো চারটে কথাকে সম্পূর্ণ হাতে পাওয়া যায়, তাকে ধরে রাখা যায়, তার মধ্যে যতটুকু যা আছে সেটা নিঃশেষ করে পাওয়া যেতে পারে। ...বাস্তবিক মানুষে মানুষে দেখাশোনার পরিচয় থেকে চিঠির পরিচয় একটু স্বতন্ত্র—তার মধ্যে একরকমের নিবিড়তা গভীরতা একপ্রকার বিশেষ আনন্দ আছে।'

৩০২.৪.১৪.৫ নমুনা প্রশ্নাবলী

ক) ছিন্নপত্রে উল্লিখিত পদ্মাতীরবর্তী জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

খ) ছিন্নপত্র পত্রসাহিত্য হিসেবে কতখানি যথার্থ তা বুঝিয়ে দাও।

গ) রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে গ্রামকে কোন নজরে দেখেছেন তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

৩০২.৪.১৪.৬ সহায়ক গ্রন্থ

রবীন্দ্রসমীক্ষা — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

আর এক আশাপূর্ণা — আশাপূর্ণা দেবী

———————

একক-১৫
ছিন্নপত্রে বিধৃত কবির ভাষাবয়ন কৌশল

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৪.১৫.১ ভূমিকা

৩০২.৪.১৫.২ ছিন্নপত্রে বিধৃত কবির ভাষাবয়ন কৌশল

৩০২.৪.১৫.৩ উপমা ব্যবহার

৩০২.৪.১৫.৪ উপসংহার

৩০২.৪.১৫.৫ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩০২.৪.১৫.৬ সহায়ক গ্রন্থ

৩০২.৪.১৫.১ ভূমিকা

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় পত্রসাহিত্য একটু ভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সাহিত্যপ্রকরণের মধ্যে পত্রসাহিত্যে যেভাবে তিনি আত্মানুসন্ধান ও আত্মানুশাসনের কথা প্রকাশ করেছেন অন্যান্য ক্ষেত্রে তার সন্ধান পাওয়া যায় না। ব্যক্তিমনের আবেগই সেখানে প্রধানকথা ও কল্পনার স্থান।সারাদিনের ব্যস্ততার মধ্যে মরজিমতো কিছু কথা চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সেই সূত্রে যে প্রাত্যহিক রবীন্দ্রনাথের দেখা আমরা পেয়েছি সেখানে যথার্থরূপেই উদ্ভাসিত হয়েছেন। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতররূপ ফুটে ওঠে এইভাবে। নিজের কথা নিজের গোপন কথা বিবেকের কথা ও বোধ বা চৈতন্যের কথা এই স্থানে গুরুত্ব পেয়েছে। বিশ্বের পানে তাকিয়ে উন্মুক্ত মন জগতের সমস্ত কিছুকে মেনে নিয়ে নিবিড় টানে কথাগুলি তিনি বলে চলেছেন যেন।রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে' আমরা সেই ধরনের লিখনের সঙ্গে পরিচিত হই। প্রত্যক্ষ বা পরিদৃশ্যমান জগতের কথা তিনি তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বলছেন, বলছেন শুধু নয়; কবির বিশাল হৃদয়ের পথগুলি উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন ক্রমশ। প্রণয়ন করেছেন ব্যক্তিপ্রাণের সঙ্গে বিশ্বপ্রাণের সমাহিত বন্ধনসূত্রটিকে। সেই বিশেষ প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিপূর্ণতা এই পর্বের ছিন্নপত্রে বিধৃত।

ভাষাবয়নের দিকটি এক্ষেত্রে উপেক্ষিত থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষাপ্রয়োগে সবসময় একটি সচেতন মন কাজ করেছে। ভাষার স্বচ্ছতা, নমনীয়তা, ভাবপ্রকাশে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনাকৌশল ও বিভিন্ন

কারুকৃতি আমাদের মুগ্ধ করে প্রতিনিয়ত। কবির মনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ভাব প্রকাশের ভাষা এখানে রচিত হয়েছে ও নির্মিত হয়েছেপৃথক বয়ানকৌশল। যে কারণে কবিচিত্তের সঙ্গে পাঠকচিত্তের সামঞ্জস্য বিধানে সহায়ক ভাষা রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে এই 'ছিন্নপত্রে' ব্যবহার করেছেন। এইটেই পত্রসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

তাঁর চিঠিতে তিনি তাই 'অপর'কে বিবেচনা না করেই সকলেরই মুখের ভাষা, প্রকৃতির ভাষা এমনকি নিজের অন্তরের প্রবল আকুতির কথা সহজসরল ভঙ্গিতেই প্রয়োগ করেছেন।

৩০২.৪.১৫.২ ছিন্নপত্রে বিধৃত কবির ভাষা-বয়ন কৌশল

রবীন্দ্রনাথ ডায়ারি জাতীয় রচনায় সচরাচর সাধারণ আটপৌরে গোত্রের শব্দচয়নে সচেষ্ট ছিলেন। তবে গদ্যের আবেদনকে অবজ্ঞা করে নয়; তাকে ছোট বড়ো আকারে রূপে ও প্রকরণে বদলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন নিরন্তর। তাই তিনি এখানে বড়ো বড়ো বাক্যবন্ধ ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করছেন। শুধু তাই নয়, চিত্রময়তা, সঙ্গীতময়তা, ধ্বনিমূর্ছনা প্রভৃতি ছিন্নপত্রকে ভিন্নমাত্রা দান করেছে। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ গদ্য লিখেছেন কবির মতো; তাঁর গদ্যের গুণ কবিতারই গুণ।' রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের ভাষাব্যবহারের কথা প্রসঙ্গে বলা চলে কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমারেখাকে মনে রেখে তিনি উপযুক্ত উপভাষা প্রয়োগ করছেন। যেমন—"মাঝিরা বলছিল, নতুন বর্ষায় পদ্মার খুব 'ধার' হয়েছে। ধার কথাটা ঠিক। তীব্র স্রোত যেন চক্‌চকে খড়্গের মতো, পাৎলা ইস্পাতের মতো একেবারে কেটে চলে যায়—প্রাচীন ব্রিটনদের যুদ্ধরথের চাকায় যেমন কুঠার বাঁধা—দুই ধারের তীর একেবারে অবহেলে ছারখার করে দিয়ে চলেছে।"

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (১৮৮১), য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি (১৮৯১, ১৮৯৩), শান্তিনিকেতন (১৯০৯-১৬), ছিন্নপত্র (১৯১২) এবং পরে ছিন্নপত্রাবলী (১৯৬০), জাপানযাত্রী (১৯১৯), যাত্রী (১৯২৯), ভানুসিংহের পত্রাবলী (১৯৩০), রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১) প্রভৃতি পত্রসাহিত্য ও ডায়ারিধর্মী রচনায় বিষয় অনুসারে ভাষাভঙ্গি প্রযুক্ত হয়েছে। সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন ভাষা-বয়নের কথা চর্চা করা যায়; এখানে প্রেক্ষিতটি একটু ভিন্ন। যেমন কথাসাহিত্যে আমরা দেখি কথকের মুখের ভাষা ও চরিত্রের মুখের ভাষা মূলত চর্চার বিষয়; কিন্তু পত্রসাহিত্যের ক্ষেত্রে একজন আরেকজনের কাছে বিশেষ কিছু প্রসঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা ভাগ করে নেন। এক্ষেত্রে পল্লীপ্রবাসী রবীন্দ্রনাথ একজন শহরবাসিনী বালিকাকে ব্যক্তিগত অনুভবের কথা ভাগ করে নিচ্ছেন। তাই এই প্রকরণের ভাষাভঙ্গিও পৃথক হতে বাধ্য। আমরা এখানে একপক্ষের বলে যাওয়া কিছু কথা পাশ থেকে কান পেতে শুনে নিতে পারি বয়ানে বিধৃতরূপে। তাই শ্রোতা হিসেবে আমরা যেটুকু পাই তা বাড়তি বলেই মনে হয়। 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র'-এর ভূমিকায় কবি বলেছেন—'আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনদের সহিত মুখোমুখি এক-প্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর-এক-প্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসংগত বলিয়া বোধ হয়।' সুতরাং প্রেরক ও প্রাপকের দিকটিই মূলত এখানে বিচার্য বিষয় বলে বিবেচিত হওয়া কাম্য। তাই পবিত্র সরকার 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি' বইতে বলেছেন, 'ছিন্নপত্র-এর আত্মকথন ও আত্মবিকাশধর্মী পত্রের ভাষাভঙ্গিতে ভিন্নন একটি সুর লাগবে—এও তো প্রত্যাশিত।'

'সাধনা'র পর্বে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' প্রকাশিত হয়। পাশপাশি 'পঞ্চভূত' 'লোকসাহিত্য' জাতীয় কিছু লঘুচালের রচনা প্রকাশ করছেন। যদিও পঞ্চভূত সাধুগদ্যে রচিত। এই সময় কবি বিষয় অনুযায়ী রচনার ভাষাচয়ন করছেন। ছিন্নপত্রের ভাষা বিষয় অনুযায়ী পরিবির্তিত হয়েছে। এখানে 'চিত্ররূপময়তা' একটি প্রধান বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। ছোটো ছোটো কথার মাধ্যমে সুন্দর চিত্র অঙ্কন করে দিয়েছেন। যেমন— 'একদিন দুপুরে স্নানের পর বারান্দার সামনে বসে আছেন এবং এই অপূর্ব দৃশ্য দেখলেন, 'আমার চোখের সামনে আমাদের বাড়ির কম্পাউণ্ডের কতকগুলি নারকেল গাছতার ও দিকে যত দূর দৃষ্টি যায় কেবলই শস্যক্ষেত্র, শস্যক্ষেত্রের একেবারে পান্তভাগে গাছ-পালার একটুখানি ঝাপসা নীল আভাস মাত্র। ঘুঘু ডাকছে এবং মাঝে মাঝে গোরুর গলার নুপূর শোনা যাচ্ছে।... খুব একটা নিঃঝুম নিঃস্তব্ধ নিরালা ভাব। বাতাস অবাধে হু হু করে বয়ে আসছে, নারকেল গাছের পাতা ঝর্ ঝর্ শব্দ করে কাঁপছে...।' (পত্র- ২৪)

'চিঠিপত্র'-এর একাদশ খণ্ডের ভূমিকায় শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'প্রত্যেক চিঠি তাঁর মুক্তাক্ষরে রচিত একটি অভাবনীয় উপহার, ভাষায় ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর, যোগ্যতার কথা ভুলে গিয়ে গ্রহণের অধিকার মেনেছি। দীর্ঘকাল তাঁর সান্নিধ্যে ছিলাম বলে চিঠির অবকাশ ঘটে নি কিন্তু সহকারীরূপে তাঁর সদ্যরচিত বহু পত্রাবলীর পরিচয়ে বঞ্চিত হই নি, আশ্চর্য হয়েছি সামান্যতম চিঠির চকিত আলোয়, অজস্রত্ব এবং বৈচিত্র্যে, দ্রুতশিল্পের বিশ্বজনীন রূপে।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন (৭১ সংখ্যক পত্রে), তাঁর মনটি সবসময় চায় বাইরের ছবিটা কাগজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলে রাখতে, তা নাহলে চিত্রটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। সেই কারণে ভ্রমণ ও পথের মধ্যে দেখা দৃশ্যের সমস্ত বর্ণনার বেশিরভাগ অংশটিই বর্তমান কালে ঘটে যাওয়া কথা। বিশেষকরে ঘটমান বর্তমানকালের নিরিখে বর্ণনা করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—১২ নং পত্রে আছে, 'এ ঘর থেকে ও ঘরে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলুম—অন্ধকার হয়ে এসেছে, গড়্ গড়্, শব্দে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুৎ, হু-হু করে এক-একটা বাতাসের দম্কা আসছে আর আমাদের বারান্দার সামনে বড়ো নিচুগাছটার ঘাড় ধরে যেন তার দাড়ি-সুদ্ধ মাথাটা নাড়িয়ে দিচ্ছেদেখতে দেখতে বৃষ্টির জলে আমাদের শুকনো খালটা পুরে গেল।' এইরকম বিস্তর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেখানে দীর্ঘ বাক্যবন্ধে নিত্য বর্তমানকালের কথা, ঘটমান বর্তমান কালের কথা, পুরাঘটিত বর্তমান কালের কথা বর্ণিত হয়েছে। শুধু চলমানতার কথা ক্রিয়াপদের রূপ বদলে দিয়েই অন্তরের অনন্ত আবেগের ইশারাটি ব্যক্ত করে দেন। ১২ নং পত্রটিতে সেইকথা বর্ণিত আছে।

ছোটো ছোটো বাক্যবন্ধের প্রয়োগে কবি একটি পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যপটকে নবতর রূপদান করছেন। ভাষাবয়নের মধ্যে দিয়ে একটি চিত্তপট নির্মাণ করে দিচ্ছেন এইভাবে, 'আমার চোখের সামনে আমাদের বাড়ির কম্পাউনডের কতকগুলি নারকেল গাছ—তার উদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলই শস্যক্ষেত্র, শস্যক্ষেত্রের একেবারে প্রান্তভাগে গাছপালার একটুখানি ঝাপসা নীল আভাসমাত্র। ঘুঘু ডাকছে এবং মাঝে মাঝে গোরুর গলায় নূপুর শোনা যাচ্ছে। কাঠবিড়ালি একবার লেজের উপর ভর দিয়ে বসে মাথা তুলে চকিতের মধ্যে অদৃশ্য হচ্ছে। খুব একটা নিঃঝুম নিঃস্তব্ধ নিরালা ভাব। বাতাস অবাধে হু হু করে বয়ে

আসছে, নারকেল গাছের পাতা ঝর্ ঝর্ শব্দ করে কাঁপছে। দু-চারজন চাষা মাঠে এক জায়গায় জটলা করে ধানের ছোটো ছোটো চারা উপড়ে নিয়ে আঁটি করে করে বাঁধছে। কাজকর্মের মধ্যে এইটুকুই কেবল দেখা যাচ্ছে।' (৩৪ নং পত্র) পরের চিঠিটি লিখছেন শিলাইদহ থেকে ১ অক্টোবর ১৮৯১, সেখানে বলছেন, 'দুপুর বেলা খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তার পরে বিকেলে পদ্মার ধারে আমাদের নারকেল-বনের মধ্যে সূর্যাস্ত হল। আমি নদীর ধারে উঠে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছিলুম। আমার সামনের দিকে দূরে আমবাগানে সন্ধ্যার ছায়া পড়ে আসছে এবং আমার ফেরবার মুখে নারকেল গাছগুলির পিছনে আকাশ সোনায় সোনালি হয়ে উঠছে। পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণে এবং গভীর ভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না।'

ছিন্নপত্রের ভাষা-বয়নের আলোচনায় ধ্বনিঝংকার সৃষ্টির প্রয়াসের বিষয়টিও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। শব্দপ্রয়োগের মধ্যে দিয়ে সুদূরে বসে থাকা মানুষটির কাছে যথাযথরূপে ধ্বনিটিকে পৌঁছে দিতেই কবির এই পদ্ধতির প্রয়োগ বলেই আমাদের ধারণা। প্রকৃতি এখানে নানা ধ্বনিতে পরিপূর্ণ, তার কথা অনুভব করার বিচক্ষণতা কবির এই পর্বের চিঠিতে উপস্থাপিত হয়েছে। শিলাইদহ থেকে ৩৮ নং চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন— 'পাড়াগাঁয়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্র মানুষ ভাবে দেখি নে। যেমন নানা দেশ দিয়ে নদী চলেছে, মানুষের স্রোতও তেমনি কলরবসহকারে গাছপালা গ্রাম নগরের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চিরকাল ধরে চলেছে— মানুষও নানা শাখা প্রশাখা দিয়ে নদীর মতোই চলেছে; দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য, মাঝখানে বিচিত্র লীলা এবং কর্ম এবং কলধ্বনি; কোনো কালে এর আর শেষ নেই। ওই শোনো মাঠে চাষা গান গাচ্ছে, জেলেডিঙি ভেসে চলেছে, বেলা যাচ্ছে, রৌদ্র ক্রমেই বেড়ে উঠছে, ঘাটে কেউ স্নান করছে কেউ জল নিয়ে যাচ্ছে—এমনি ক'রে এই শান্তিময়ী নদীর দুই তীরে, গ্রামের মধ্যে, গাছের ছায়ায়, শত শত বৎসর গুন্‌গুন্ শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে এবং সকলের মধ্যে থেকে একটা করুণ ধ্বনি জেগে উঠছে; ... দুপুর বেলার নিস্তব্ধতার মধ্যেযখন কোনো রাখাল দূর থেকে ঊর্ধ কণ্ঠে তার সঙ্গীকে ডাক দেয়, এবং একটা নৌকা ছপ্ ছপ্ শব্দ ক'রে ঘরের দিকে ফিরে যায়, এবং মেয়েরা ঘড়া দিয়ে জল ঠেলে দেয় তারই ছল্‌ছল্ শব্দ ওঠে, তার সঙ্গে মধ্যাহ্নপ্রকৃতির নানারকম অনির্দিষ্ট ধ্বনিদুই-একটা পাখির ডাক, মৌমাছির গুন্ গুন্, বাতাসে বোটটা আস্তে আস্তে বেঁকে যেতে থাকে তারই একরকম কাতর সুর—সবসুদ্ধ এমন একটা করুণ ঘুমপাড়ানি গান, যেন মা সমস্ত বেলা বসে বসে তার ব্যথিত ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে...।'

৩০২.৪.১৫.৩ উপমা ব্যবহার

প্রকৃতির বুকে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উপমিত করে রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপন করছেন। বেশিরভাগ মেঘের ডাক, পাখির কতলান, বৃষ্টিপতনের কথা, নদীর জলের বয়ে যাওয়ার ধ্বনিঝংকারকে নানাভাবে উপমিত করেছেন। মেঘের ডাক ও ভয়ংকর রকমের ঝড়বৃষ্টির বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি ২৪ নং পত্রে বলেছেন, 'খানিকবাদে একটা আক্রোশের গর্জন শোনা গেল; কতকগুলো ছিন্নভিন্ন মেঘ

ভগ্নদূতের মতো সুদূর পশ্চিম থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল—তার পরে বিদ্যুৎ বজ্র ঝড় বৃষ্টি সমস্ত একসঙ্গে এসে পড়ে খুব একটা তুর্কি-নাচন নাচতে আরম্ভ ক'রে দিলে, বাঁশগাছগুলো হাউহাউ শব্দে একবার পূর্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল, ঝড় যেন সোঁ সোঁ ক'রে সাপুড়ের মতো বাঁশি বাজাতে লাগল, আর জলের ঢেউগুলো তিন লক্ষ সাপের মতো ফণা তুলে তালে তালে নৃত্য আরম্ভ ক'রে দিলে।'

সাজাদপুর থেকে বোটের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন ২৫ নং পত্রে, 'আমাদের বোটের দুই পাশের পর্দা বাতাসে আছাড় খেয়ে খেয়ে শব্দ করতে লাগল, আমাদের বোটটা যেন একটা শিকলিবাঁধা পাখির মতো পাখা ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্ করছিল—ঝড়টা থেকে থেকে চীঁহি চীঁহি শব্দ ক'রে একটা বিপর্যয় চিলের মতো হঠাৎ এসে প'ড়ে বোটের ঝুঁটি ধ'রে ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়, বোটটা অমনি সশব্দে ধড়্‌ফড়্ ক'রে ওঠে।' ৪৩ নং চিঠিতে মেয়েদের সঙ্গে জলের কল্পনাসাদৃশ্য আমাদের মুগ্ধ করে করে। নদীর চরে পুরুষেরা স্নান করে। গম্ভীরভাবে গোটাকতক ডুব দিয়েই নিত্যকর্ম সম্পন্ন করে। কিন্তু; মেয়েদের তাতে চলে না, 'মেয়েদের যেন জলের সঙ্গে বেশি ভাব—পরস্পরের যেন একটা সাদৃশ্য এবং সখিত্ব আছে। জল এবং মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে ছল্ ছল্ জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে—একটা বেশ সহজ গতির তরঙ্গ, দুঃখতাপে অল্পে অল্পে শুকিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আঘাতে একেবারে জন্মের মতো দুখানা হয়ে ভেঙে যায় না।' এই সহজ প্রবাহের রীতির কথা আমরা শুনে থাকি, 'মেয়েরা যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের আকার ধারণ করে।' আসলে ধারণ ও ধরন দুইই মেয়েদের সহজেই করতে হয়। তাই জলের মতোই স্বচ্ছ, নির্মল, আনন্দমুখর ও সদাচঞ্চল থাকতে হয়। খুব স্বল্পকথায় কবি একটি গভীর মনের ভাবকে তুলে ধরেছেন।

বোলপুরের ঝড় আর আমেরিকার ঝড়ের তুলনা ও প্রতিতুলনায় তিনি বলেছেন (পত্র-৪৭), 'ঝড়টা দেখে আমার পড়ছিল, আমেরিকার ranch সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যেরকম বর্ণনা পড়া যায়—হঠাৎ কোনো একটা বেড়া ভেঙে ফেলে ছ-সাতশো বুনো ঘোড়া ধুলো উড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে, আর তার পিছনে পিছনে তাদের তাড়িয়ে ফিরিয়ে আনবার জন্যে বড়ো বড়ো ফাঁস হাতে অনেকগুলো অশ্বারোহী ছুটছে; মাঝে মাঝে যেখানে যাকে পাচ্ছে সাঁই সাঁই শব্দে দিচ্ছে চাব্‌কে—বোলপুরের অবারিত আকাশ এবং মাঠের মধ্যে যেন সেইরকমের একটা উচ্ছৃঙ্খল পলায়ন এবং পশ্চাদ্ধাবন চলছেদৌড়্-দৌড়্ ধর্-ধর্ পালা-পালা হুড়্-মুড়্ দুড়্-দাড়্ ব্যাপার।'

৯৪ নং পত্রে আছে একদিন কালীগ্রামের পথে একটি বিলের চেহারা দেখে তাঁর মনে হয় 'দুই দিকে দুই তীর দিয়ে সীমাবদ্ধ না থাকলে জলস্রোতের তেমন শোভা থাকে না। অনির্দিষ্ট অনিয়ন্ত্রিত বিল একঘেয়ে শোভাশূন্য। ভাষার পক্ষে ছন্দের বাঁধন ঐ তীরের কাজ করে। ভাষাকে একটি বিশেষ আকার এবং বিশেষ শোভা দেয়, তার একটি সুন্দর চেহারা ফুটে ওঠে। তীরবদ্ধ নদীগুলির যেমন একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, তাদের যেমন এক-একটি স্বতন্ত্র লোকের মতো মনে হয়, ছন্দের দ্বারা কবিতা সেইরূপ এক-একটি মূর্তিমান অস্তিত্বের মতো দাঁড়িয়ে যায়। গদ্যের সেইরকম সুন্দর সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্য নেই, এসে একটা বৃহৎ বিশেষত্বহীন বিলের মতো।' ভাষার সঙ্গে বিলের জল ও তার দুই তীর যেভাবে উপমিত হয় তা এই পত্রে অভিনব একটি দৃষ্টান্ত।

৩০২.৪.১৫.৪ উপসংহার

বলা বাহুল্য একজন মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ গোপন থাকে তাঁর দ্বারা রচিত চিঠিতে। চিঠি হল একজন মানুষকে নানা দিক থেকে চেনা ও জানার একটি সুযোগমাত্র। এখানে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়ে থাকি সাহিত্যিক, সাহিত্যসমালোচক, দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজকর্মী, ও প্রকৃতিপ্রেমিক হিসেব। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বহুমাত্রিক চিন্তাচেতনার কথা তিনি খুব সহজ সরল ভাষাতে উল্লেখ করেছেন। যাঁকে চিঠিগুলি পাঠাচ্ছেন তিনিও সেই জ্ঞানের অধিকারী ভেবেই কবি উক্ত পদ্ধতিতে ভাষাচয়ন করছেন। তাই মনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিন্তার কথা, ভালো লাগার কথা, সরল অনুভূতির খুব সহজেই আমরা অনুধাবন করতে পারি। 'পত্রধারা' (১ম-৩য় খণ্ড), (১ম সং ১৩৪৫ সাল)—এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বেলছেন, সাধারণ সাহিত্য ও পত্রসাহিত্যের মধ্যে একটি পার্থক্য সবসময় থেকেই যায়। অর্থাৎ, 'সাধারণ সাহিত্যকে টানে বিরাট পাঠককেন্দ্র, চালায় দূর দেশ দূরকালের পথে ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে। আর চিঠির সাহিত্যে ধরা দেয় লেখকের কাছঘেঁষা জগতের দৈনিক ছায়া প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনি প্রতিধ্বনি, তার ক্ষণিক হাওয়ার মর্জি আর তার সঙ্গে প্রধানত মিলিয়ে থাকে সদ্যপ্রত্যক্ষ সংসার পথের চলতি ঘটনা নিয়ে আলাপ প্রতিলাপ।' সুতরাং ভাষা উপমা গদ্যছন্দ প্রভৃতি এই ধরনের পত্রবন্ধ অলংকৃত করা হয় খুব হালকা চালে।

৩০২.৪.১৫.৫ নমুনা প্রশ্নাবলী

ক) রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রে ভাষাবয়নের দিকটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

খ) চলিত গদ্যের প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত—ছিন্নপত্র অবলম্বনে বিষয়টি বুঝিয়ে দাও।

৩০২.৪.১৫.৬ সহায়ক গ্রন্থ

রবীন্দ্রমনীষা — অশ্রুকুমার সিকদার

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ — রাণী চন্দ

আর এক আশাপূর্ণা — আশাপূর্ণা দেবী

———————

একক ১৬

রবীন্দ্রভাবনা : সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য সমালোচনা

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৪.১৬.১ ভূমিকা

৩০২.৪.১৬.২ আত্মকথা ও দার্শনিক উপলব্ধি

৩০২.৪.১৬.৩ রবীন্দ্রভাবনা : সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য সমালোচনা

৩০২.৪.১৬.৪ উপসংহার

৩০২.৪.১৬.৫ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩০২.৪.১৬.৬ সহায়ক গ্রন্থ

৩০২.৪.১৬.১ ভূমিকা

১৮৮৩ সাল রবীন্দ্রজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই বছরে কবির বিবাহ হয়েছিল মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে আর এই বছরেই কবি জমিদারির আংশিক দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' (পৃ ৯) বইতে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, 'বাস্তবকে প্রকৃতির সহিত জীবনে মিশাইয়া এমন নিবিড়ভাবে পাইবার সুযোগ ইতিপূর্বে হয় নাই। প্রকৃতি ও মানুষকে মিলিয়া বিশ্বের সৃষ্টিসৌন্দর্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গভাবে জানিয়েছিলেন, মানুষকে তেমন নিবিড়ভাবে জানিতে সুযোগ লাভ করেন নাই। জমিদারী পরিদর্শন ও পরিচালনা করিতে আসিয়া বাংলার অন্তরের সঙ্গে তাঁহার যোগ হইল—মানুষকে তিনি পূর্ণদৃষ্টিতে দেখিলেন। ... রবীন্দ্রনাথ ধনী জমিদার, এবং বাহিরের লোক। কাজেই তথাকার পল্লীজীবনের সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার উপায় ছিল না। পল্লীজীবনের মধ্যে মিলিত হইবার ইচ্ছা যতই প্রবল হোক, বাধা দুর্লঙ্ঘ্য; ফলে তাঁহাকে দূর হইতে, বাহির হইতে দেখিতে হইয়াছে।' এখানে দেখা দৃশ্যগুলি খণ্ড খণ্ড, অভিজ্ঞতাও সাময়িক; কিন্তু ভাবনাগুলি সুদূরপ্রসারী এবং সুসংহত। পল্লীবাসীদের জীবনচিত্র দেখে কবির মনে জাগ্রত প্রবণতাগুলি ছোটো ছোটো অভিজ্ঞতার আকারে রূপ পেতে থাকে। 'সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ' মানবজীবন ও জগৎসংসার সম্পর্কে কবির প্রতিক্রিয়ার সৌন্দর্যলোকের সন্ধান

পাওয়া যায় এই ছিন্নপত্রের যুগে। কবির নিরুদ্দেশলোকে যাত্রার আঙ্গিক বর্ণিত হয় এই পত্রালাপের সূত্রে। অন্তরের বাণীকে পূর্ণতররূপ দিতে চেয়েছেন এই পত্রগুলিতে। পদ্মানদীকেন্দ্রিক জীবনাভিজ্ঞতার যে বর্ণনা আছে সেখানে—ইতিহাস, ভূগোল, কল্পনা, দর্শন প্রভৃতি মিলেমিশে আছে।

এই পর্বের রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই কবি, সাহিত্যিক, বিশেষকরে ছোটোগল্পকার, নন্দনতাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও পল্লীবাসী হিসেবে। 'আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা' শুরু হয় ছিন্নপত্রের যুগেই। এই পত্রগুলিতে তিনি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সেই ভঙ্গি 'জীবনস্মৃতি' 'ছেলেবেলা'-তেও পাওয়া যায় না। তাই কবির এই পর্বের দর্শন ও আত্মকথার ভাব বুঝতে হলে ছিন্নপত্রের স্মরণ নিতে হয়।

৩০২.৪.১৬.২ আত্মকথা ও দার্শনিক উপলব্ধি

রবীন্দ্রনাথ পড়েই আমরা শিখেছি মানুষের মধ্যে দুটি সৃষ্টিশীল মন কাজ করে—একটি ব্যক্তিগত ও অপরটি বিশ্বপ্রাণেযুক্ত মানবত্ব। একটির কর্তা আমি ও অন্যটির কর্তা জীবনদেবতা। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যধারায় এই আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের প্রমাণ পাওয়া খুব একটা দুঃসাধ্য বিষয় নয়। 'ছিন্নপত্র' রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা, স্মৃতিকথা নয়। আত্মকথা বলবার কারণ হল ব্যক্তিগত বোধ ও চৈতন্যের কথা এই পত্রগুচ্ছের পরতে পরতে সংলিপ্ত। সুন্দর একটি দৃশ্য দেখার পর কবিমনের অভিব্যক্তির প্রতিফলনস্বরূপ এই পত্রগুচ্ছ। রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যের একটি বড়ো শাখা হল এই পত্রধারা। ছিন্নপত্র সেই ধারার একটি অভিনব সংযোজন। নামমাত্র পত্র হলেও এর সিং হ ভাগ অধিকার করে আছে কবিহৃদয়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা, সাহিত্য সমালোচনা, পারিবারিক কথা, প্রকৃতিদর্শনের অভিব্যক্তির কথা প্রভৃতি বিষেষভাবে স্থান করে নিয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খন্ড, পৃ ৪৩৮)—'এই পত্রধারার বৈশিষ্ট্য ঘটনা সরবরাহের খনি-গুণত্ব নহে, ইহার সুপ্রতিষ্ঠিত স্থান হইতেছে রবীন্দ্র-মানসের বিবর্তন-ইতিহাসের আকরত্ব-গুণে। আর পরিশোধিত ছিন্নপত্র বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবেও উপভোগ্য। সেইজন্য বহুবার পাঠ করিলেও ছিন্নপত্র ম্লান হয় না। ইহার মধ্যে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির পরিপূর্ণ জীবনযৌবনের, পরিচ্ছন্ন দেহমনের অসংখ্য অভিজ্ঞতা ও অনুভাব কীভাবে ধীরে ধীরে নানা বর্ণে, শতদলের কোরকের প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইতেছে তাহার সন্ধান পাই।'

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ যেন আত্মউদ্ঘাটনের পথ বেছে নিয়ে একজন পল্লীবাসীর মনের কথা উত্থাপন করেছেন একজন শহরনিবাসী বালিকার কাছে। ৫৩ নং পত্রে কবি বলেছেন, 'যতই একলা আপন-মনে নদীর উপরে কিম্বা পাড়াগাঁয়ে কোনো খোলা জায়গায় থাকা যায় ততই প্রতিদিন পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, সহজ ভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর-কিছু হতে পারে না। মাঠের তৃণ থেকে আকাশের তার পর্যন্ত তাই করছে; কেউ গায়ের জোরে আপনার সীমাকে অত্যন্ত বেশি অতিক্রম করবার জন্যে চেষ্টা করছে না বলেই প্রকৃতির মধ্যে এমন গভীর শান্তি এবং অপার সৌন্দর্য।' অর্থাৎ ক্ষুদ্রতার মধ্যেই মহতের বীজ সদা লুকিয়ে থাকে। আসলে ক্ষুদ্রতা ও যথার্থতার মধ্যেই

প্রকৃত সৌন্দর্য ও প্রকৃত আনন্দ। কবি মনে করেন, 'কবিত্বই বলো আর বীরত্বই বলো, কোনোটাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু একটি অতি ক্ষুদ্র কর্তব্যের মধ্যেও তৃপ্তি এবং সম্পূর্ণতা আছে... যিখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা যায়, নিজের সাধ্যায়ত্ত সমস্ত কর্তব্য সত্যের সঙ্গে, বলের সঙ্গে, হৃদয়ের সঙ্গে, সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে পালন করে যাব, এবং যখন বিশ্বাস হয় তা করতে পারব, তখন সমস্ত জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে—ছোটোখাটো দুঃখবেদনা একেবারে দূর হয়ে যায়।'

কবিমনের একটি অভিব্যক্তির কথা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী'র (১ম খণ্ড, পৃ ৪৩৪) বলেছেন, 'সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়ত গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন—তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, বিপুলের সহিত, বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দেতেছেন।' এইভাবে জীবনদেবতার প্রসঙ্গে কবির প্রাণ বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়ে বারবার আবেদন নিবেদন করেছে।

সংসারে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনাকে তিনি নিবিড় দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন। যা দুর্গম বা দুর্বোধ্য বিষয় তা কবিদৃষ্টিতে বা কবিস্পর্শে হয়ে উঠেছে সহজ সরল এবং মহৎ। জগতের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা সুখ এবং দুঃখের এই রূপ হলে আমাদের আর কষ্ট থাকে না। এই দর্শন রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব। পত্র ১২৩-এ বলেছেন—'আমি অনেক সময় ভেবে দেখেছি , সুখী হলুম কি দুঃখী হলুম সেইটে আমার পক্ষে শেষকথা নয়। আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখদুঃখের ভিতরে নিজের একটা প্রসার অনুভব করতে থাকে। আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরজীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে মাত্র, কিন্তু দুটো এক নয়—এ আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করি। আমাদের ক্ষণিক জীবনই সুখ দুঃখ ভোগ করে; আমাদের চিরজীবন সেই সুখ-দুঃখ নেয় না, তার থেকে একটা তেজ সঞ্চয় করে...।' আমরা যতই দুঃখ ভোগ করি ততই পরিণত হয়ে উঠি। আমাদের পূর্ণাঙ্গতার প্রকৃতরূপ স্নেহপ্রীতির মিশ্রিত সুখে নয়—সে জীবন থাকে আমাদের চিরপরিচিত দুঃখে। আমরা আমাদের জীবনে সচরাচর সুখ ও ভোগবাসনার দিকেই ধাবমান থাকি; কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে বোধগম্য হয় আসলে প্রকৃত আনন্দ দুঃখের সাগরে নিজেকে নিক্ষেপ করে। নিছক নিদান দেওয়ার সূত্রে এইকথাগুলি কবি বলছেন না, তিনি নিজের জীবন দিয়ে কথাগুলি অনুভব করেছেন। নিবিষ্ট চিত্তে আজ এই বিষয় নিয়ে ভাবতে গিয়ে তাঁর এই সরল নিবেদন।

আমরা নিজেকে কীভাবে জানি সেই পথের সন্ধান দিতে পারেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা যখন বেঁচে আছি তখন এক অর্থে এই সমাজের মানুষ ও একই সঙ্গে বিশ্বজগতের মানুষ। সমগ্র জীবনে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্নরূপে তাকে প্রকাশ করেছেন। এখানেও একটি দৃষ্টান্ত যুক্ত হতে পারে। পত্র ১৩০-এ বলেছেন 'দিন ও রাত্রি, কাজ ও বিরামের উপমা। দিনের বেলায় পৃথিবী ছাড়া আর আমাদের কিছুই নেই; রাত্রে পৃথিবীটাই কম, অনন্ত জ্যোতিষ্কজগৎটাই বেশি। তেমনি কাজের দিনে যুক্তিতর্কের আলোকে পৃথিবীটাকেই খুব স্পষ্ট করে চোখের সামনে রাখা চাই; কিন্তু যখন বিশ্রামের সন্ধ্যা, তখন পৃথিবীটাকে হ্রাস করে

দেওয়াই দরকার, তখন বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে বিরাট যোগ আছে সেইটেকেই বড়ো করে দেখা চাই। সকালবেলায় উঠে জানা চাই আমরা পৃথিবীর মানুষ, দিন অবসান হয়ে এলে অনুভব করা চাই আমরা জগৎবাসী।'

৩০২.৪.১৬.৩ রবীন্দ্রভাবনা: সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ চিঠির মধ্যে দিয়ে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, নিজেকে অপরের কাছে উন্মিলিত করেছেন তেমনভাবে আর কোথাও করেননি। বাস্তবে দেখা কিছু অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাহিত্যে প্রতিফলিত অভিজ্ঞতার কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে পদ্মার যে ভয়ঙ্কর রূপের কথা আছে তার সঙ্গে ১৪৩ নং পত্রে সেকথা কিছু ব্যক্ত হয়েছে। 'ছুটি', 'পোস্টমাস্টার', 'অতিথি' প্রভৃতি গল্পের ভিত্তিভূমি এই পদ্মাসংলগ্ন জীবনচিত্রসম্বলিত যাত্রার অভিজ্ঞতা। 'জাভা-যাত্রীর পত্র' (২নং)—এ তিনি বলেছেন, 'স্রোতের জলে যে ধ্বনি সেটা তার চলারই ধ্বনি, উড়ে-চলা মৌমাছির পাখার যেমন গুঞ্জন। আমরা যেটাকে বকুনি বলি সেটাও সেই মানসিক চলে যাওয়ারই শব্দ। চিঠি হচ্ছে লেখার অক্ষরে বকে যাওয়া।' কবিতা লিখতে তিনি সিদ্ধহস্ত এবং কবি হিসেবেই পরিচিত হতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন বেশি। কবি বলেছেন (পত্র নং- ৮০), 'কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী—বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দত্তা হয়েছিল। ...সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।'

রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা শব্দটিকে নানান স্থানে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন—তিনি কখনও বলেছেন বিচার, কখনও ব্যাখ্যা, কখনও বিশ্লেষণ প্রভৃতি। তবে ৪৯ নং পত্রে বলেছেন, 'একটি কবিতা লিখে ফেললে যেমন আনন্দ হয়, হাজার গদ্য লিখলেও তেমন হয় না কেন তাই ভাবছি। কবিতায় মনের ভাব বেশ একটি সম্পূর্ণতা লাভ করে; বেশ যেন হাতে ক'রে তুলে নেবার মতো। আর, গদ্য যেন এক-বস্তা আল্‌গা জিনিস—একটি জায়গা ধরলে সমস্তটি অমনি স্বচ্ছন্দে উঠে আসে না; একেবারে একটা বোঝা বিশেষ। রোজ রোজ যদি একটি ক'রে কবিতা লিখে শেষ করতে পারি তা হলে জীবনটা বেশ একরকম আনন্দে কেটে যায়।... আর্টের একটা প্রধান আনন্দ হচ্ছে স্বাধীনতার আনন্দ—বেশ আপনাকে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া যায়...।'

সাজাদপুর থেকে ২৯ জুন একটি চিঠিতে (৫৯ নং) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'যখন আমাদের কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট্ অফিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনই আমি

একদিন দুপুরবেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্ট্ মাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম। ...যাই হোক, এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে।' সেই মানুষটির কথায় সুপ্ত আছে নগরজীবনে চিরঅভ্যস্ত এক মানুষের কথা, যাকে গ্রামে এনে ফেলে দিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ জমিদারী দর্শনের শুরুর দিকে মনে করতেন এইটি তাঁর কছে মনে হয়েছিল কোনো এক অজ্ঞেয় কারণে পিতৃদেব শাস্তিস্বরূপ তাঁকে এই পল্লীবাংলার বুকে ঠেলে দিয়েছেন। কিন্তু বেশ কিছু সময় কাটানোর পর তিনি মনে করেন এক মায়াঘন জগতে প্রবেশ করেছেন। যার কামনা তিনি দীর্ঘকাল করে এসেছেন। পোস্টমাস্টার যে দ্বারের সন্ধান পায়নি কবি যেন সেই দ্বারের সন্ধান পেলেন। অদৃষ্টিগোচর বৃহৎ অট্টালিকাঘেরা শহরের বাইরে যে একটি এমন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন জগৎ থাকতে পারে সেকথা এমন স্থানে না গেলে তিনি উপলব্ধি করতেই পারতেন না।এই কথা তিনি বার বার স্মরণ করেছেন ছিন্নপত্রের বিভিন্ন স্থানে। 'ছুটি' গল্পের প্লট নির্মিত হয় এই সাজাদপুরে থাকতেই। গ্রামের বালকদের যে উদ্দাম, অত্যন্ত প্রবল, অসংযত ও লাগামছাড়া জীবন থাকে তা তিনি একদিন বিকেলে কয়েকটি বালককে ঘাটের উপরে খেলতে দেখেই বুঝেছিলেন। শুধু সেই চরিত্রগুলি এসেছে তা নয়, তাদের খেলার ভঙ্গির কথাও উপস্থাপিত হয়েছে এইভাবে—একটি নৌকার মাস্তুলকে সবাই মিলে ঠেলে সরানোর খেলায় মত্ত হয়ে তারা বলে, 'সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো! মারো ঠেলা হেঁইয়ো।'

এই পর্বের রবীন্দ্রনাথের হাতে বেশ কিছু বই থাকছে চলার সঙ্গী হিসেবে—সেখানে 'নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচর' থেকে আরম্ভ করে শেক্সপীয়র পর্যন্ত নানান রকমারি বই। কিন্তু কবি সমালোচনা করে চলেছেন নিজের কিছু কিছু রচনা সম্পর্কে। সেই দিকটিই প্রধানত এই সূত্রে আমরা আলচনায় রেখেছি। 'মেঘদূত'-এর কথা ঘুরেফিরে বহুবার উচ্চারিত হলেও সেখানে শুধু অনুষঙ্গ ও সাদৃশ্যকল্পনা আছে, সমালোচনা বা রচনার প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। তাই একটি মাত্রায় আমরা নির্দিষ্ট যে, যেখানে রচনার প্রেক্ষিত ও সমালোচনা গোত্রের কোনো কথা এসেছে সেখানেই আমরা আমাদের আলোচনা বিস্তৃত করা হয়েছে।

সৃষ্টি সম্পর্কে স্রষ্টা রবিন্দ্রনাথের মত ঠিক কেমন তার কথা আছে ৯২ নং পত্রে। একদিকে সাধনার জন্যে লেখা দিতে হবে, অন্যদিকে কবিতা লিখতেই কবির বেশি ভালোলাগা ভাব। স্পর্শকাতর এই বিষয়টির নিষ্পত্তি করেছেন মীমাংসক কবি। তিনি বলেছেন—'আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক-এক সময় মনে হয়, আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে—লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। এক-এক সময় মনে হয় আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবে উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়, সেগুলো ডায়ারি প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভালো; বোধ হয় তাতে ফলও আছে,আনন্দও আছে। একএক সময় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা খুব দরকার, যখন আর কেউ করছে না তখন কাজেই আমাকে এই অপ্রিয় কর্তব্যটা গ্রহণ করতে হয়—আবার এক-এক সময় মনে হয়, দূর হোক গে ছাই, পৃথিবী আপনার চরকায় আপনি তেল দেবে এখন...।' বিস্তৃত আকারে সাহিত্যসৃষ্টির

বিকল্পবয়ান এইভাবে আমরা এখানে পেয়ে থাকি। কর্তব্য আর ভালোলাগার মধ্যে যখন দড়ি টানাটানি চলে তখন স্রষ্টা যে কী সংকটে পড়েন তার আপনকথাটি আমরা এইভাবে শুনে নিতে পারি। নির্মিত হয় স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের হয়ে ওঠার কথা ও কাহিনি।

একটি 'তিব্বতভ্রমণের বই' পড়তে গিয়ে ভ্রমণকাহিনী সম্পর্কে এইপর্বে তাঁর অভিমত—'ভ্রমণবৃত্তান্তের একটি মস্ত সুবিধা এই যে, তার মধ্যে অবিশ্রাম গতি আছে অথচ প্লটের বন্ধন নেইমনের একটি অবারিত স্বাধীনতা পাওয়া যায়।' (পত্র-১২৭) সাহিত্যকেও প্রকৃতির সঙ্গে সংলিপ্ত করে নিয়ে দেখলে সাহিত্যের আসল তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়—এ কথা রবীন্দ্ররচনা দিয়েই আমরা বুঝি। শান্তিনিকেতনের পরিমণ্ডলে না গেলে যেমন রবীন্দ্ররচনার সিংহভাগ উদ্ধার করা যায় না তেমনি বাংলাদেশের এই প্রত্যন্ত ভূমিতে না গেলে রবীন্দ্ররচনার অনেক ক্ষেত্র অকর্ষিতভূমিরূপেই অবহেলিত হয়ে থেকে যায়। তাই আমাদের মনের সঙ্গে স্থানের একটি মিতালির সম্পর্ক হওয়া চায়। বিশেষকরে রবীন্দ্রকাব্য স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই বহন করে চলছে রবীন্দ্রভাবনার বন্যস্ত নানান অধায়ের পৃষ্ঠাগুলির মৌলিক কথা ও দার্শনিক উপলব্ধির ঝলকগুলি।

৩০২.৪.১৬.৪ উপসংহার

রবীন্দ্রদর্শনের ভিত্তিভূমি হল মানুষ। আবার কবির এই মানবতাবোধ গড়ে উঠেছে ঈশ্বর বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ মানুষকে, প্রকৃতিকে ও সমস্ত জীবজগৎকে পরিপূর্ণরূপে দেখলেন। কবি বিশ্বাস করতেন পরিপূর্ণতাবোধের মধ্যেই অমরতা আছে আদর্শ আছে শান্তি আছে। জন্মজন্মান্তরব্যাপী মানুষের জয়যাত্রা কোন পথে চলেছে তার প্রত্যক্ষরূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসৃষ্টির মহৎবাণী রচিত হয়েছে পল্লীর এই প্রান্ত থেকে প্রান্তরে। এই জগতে মানুষ আছে, আছে শতসহস্র দুঃখ-যন্ত্রণা, বিয়োগজ্বালা। সমস্ত কিছুই আমাদের পরিপূর্ণ করে তোলে। শূন্য থেকে পরিপূর্ণতার দিকে যাওয়ায় আমাদের প্রধান লক্ষ্য। শাশ্বত মানুষকে অবলম্বন করে পূর্ণতার আদর্শ সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এই পূর্ণতার পথে অন্তর্গূঢ় বাসনাই মানুষকে সৃষ্টিকর্মে প্রণোদিত করে। আর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ও প্রকাশের মধ্যে দিয়েই মানুষ ঋণশোধ করতে পারে পরিপূর্ণরূপে মেলে ধরতে পারে। এই প্রকাশেই মানবতার প্রকাশ। মানুষ সম্পর্কে ধরণা করতে গিয়ে তিনি বলেন 'পৃথিবীতে আমরা যাদের জানি সবাইকেই ফুটকি লাইনে জানি—অর্থাৎ মাঝে মাঝে অনেকখানি ফাঁক...।' কীভাবে সেই ফাঁক পুরণ করা যায় সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—'আমরা নিজেকেও অংশ-অংশ ক'রে জানি—কল্পনা দিয়ে পুরিয়ে নিয়ে একটা স্বরচিত গল্পের নায়ক নায়ক ক'রে নিই মাত্র। খন্ড উপকরণ নিয়ে আমরা নিজেকে নিজে সৃষ্টি ক'রে তুলব ব'লেই বিধাতা এই বিচ্ছেদগুলি রেখে দিয়েছেন।' ছিন্নপত্রে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মনের বিশেষ বিশেষ উদ্যোগগুলির খবর বর্ণিত হয়ে যায় এভাবেই। প্রকৃতির এই উর্বরভূমি তাঁর সৃষ্টি-ফসলের উপযুক্ত হয়েছে সবসময়। উপভোগ্য ও মনোরম পরিমণ্ডলের কোলে বসে তাঁর একান্ত অনুগত ভাবগুলিকে তিনি এই সমস্ত পত্রালাপে তুলে ধরেন।

৩০২.৪.১৬.৫ নমুনা প্রশ্নাবলী

ক) রবীন্দ্রদর্শননের একটি ঝলক কিছু কিছু পত্রে কীভাবে খঁজে পাওয়া যায় কীভাবে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

খ) এই পর্বে অর্থাৎ ছিন্নপত্র রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রটি কেমন ছিল সে সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

৩০২.৪.১৬.৬ সহায়ক গ্রন্থ

পথে ও পথের প্রান্তে- রবীন্দ্রনাথ

———————